ঢাকার
পূজা পার্বণ
বঙ্কিম কৃষ্ণ দে

চাকমা পূজা পার্বণ

শ্রী বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্‌ষ্টিটিউট
রাংগামাটি।

প্রথম প্রকাশ : মার্চ / ১৯৮৯ ইং, ফাল্গুন / ১৩৯৫ বাংলা।

প্রকাশক : সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা
পরিচালক
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট
রাংগামাটি।

প্রচ্ছদ : সুনীতি জীবন চাকমা

মুদ্রক : কালী শংকর দেওয়ান
সরোজ আর্ট প্রেস
রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি।

সূচীপত্র ঃ

চাকমা পূজা পার্বণ

চাকমা সমাজে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তার জন্যে কোন শাঁখ বাজেনা, উলুধ্বনি উঠেনা,—কোন প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানই তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকেনা। শুধু যখন নবজাতকের নাভি ঝরে যায় তখন একটা মাত্র অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে জাতকসহ প্রসূতি পরিশুদ্ধ হয়ে হেঁসেলে ঢোকার অনুমতি পায়। এ অনুষ্ঠানের নাম 'কজই পানি লনাহ্'। চাকমা বিশ্বাসমতে সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির এক ধরণের অশুচিতা জন্মে, সে জন্যেই এই অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষ্যে দু'একজন লোক খাওয়ানো হয়ে থাকে। শিশুর নাম করণেরও কোন আনুষ্ঠানিকতার বালাই নেই। বর্তমান শিক্ষিত সমাজের কথা বাদ দিলে, গ্রামের সাধারণ গৃহস্থ ঘরে মা, বাপ, খুড়ো, জ্যেঠা যার যা' খুশী একটা ডাকতে ডাকতেই শিশুর চলনসই একটা নাম চালু হয়ে যায়। কারো কারো পোশাকী নামও অবশ্য একটা থাকে। বিশেষতঃ পাঠশালায় যারা যায়, শিক্ষক মহাশয়ের হাতেই তাদের নামকরণ ঘটে। এভাবে একজন চাকমা শিশু জন্মের পর থেকে সরল অনাড়ম্বর পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে। ছেলে হোক আর মেয়েই হোক সমাজে কিন্তু সব শিশুদের সমান কদর।

ভিন্ন সমাজে শিশুর জন্মলগ্ন থেকে অন্নপ্রাসন, নামকরণ ইত্যাদি একটার পর একটা উৎসব লেগে থাকে; সেক্ষেত্রে চাকমা সমাজে অনুরূপ অনুষ্ঠানাদির অনুপস্থিতি স্বভাবতই চাকমা সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা বিসদৃশ ধারণা জন্মে। আরো মজার কথা, চাকমাদের মধ্যে নৃত্যগীত সমন্বিত কোন জাতীয় উৎসবেরই প্রচলন নেই। জাতীয় নৃত্যতো নেই বললেই চলে। গানের মধ্যেও কয়েকটা মাত্র সুরের সন্ধান পাওয়া যায়; যেমন, 'অলি'

অর্থাৎ ঘুমপাড়ানী গান, উভাগীত, *গেংখুলীদের পালাগানের সুর ইত্যাদি। এসব কিছুর পেছনে কারণ কিন্তু একটাই। বৃটিশ শাসনাধীনে আসার আগ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দীকাল চাকমারা বিরূপ পারিপার্শ্বিকতার টানা পোড়নে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এই সময় দক্ষিণে মগ এবং পূর্ব-দিক থেকে লুসাই উপজাতির ক্রমাগত হামলার মুখে তাদের একরূপ পালিয়ে বেড়াতে হয়। তাই নন্দন সংস্কৃতি বলতে যা' বোঝায়, চাকমাদের মধ্যে তা' গড়ে উঠার সময় এবং সুযোগ কোনটাই ছিলনা। এ সময়ে রচিত একটা ছড়ার মধ্যে তৎকালীন চাকমাদের দুরবস্থার একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যায়,—

'ঘরত্ গেলে মঘে পায়,
ঝারভ্ গেলে বাঘে খা'য়।
মঘে ন পেলে বাঘে পায়,
বাঘে ন পেলে মঘে পায়।'

[ঘরে গেলে মঘে পায়, ঝাড়ে অর্থাৎ জঙ্গলে গেলে বাঘে খায়। মঘে না পায় তো বাঘে পায়, বাঘে না পায় তো মঘে পায়।]

আর লুসাইদের উপদ্রব তো বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার মত 'কুগী ডর' অর্থাৎ কুকীর ভয় নামে আজো কিংবদন্তী হয়ে আছে। এমনকি বৃটিশ আসার পরও এদের হামলার কোন কমতি ছিলনা। কথিত আছে, লুসাইরা একরাত্রে বাইশ মৌজার উপর হামলা চালায়, যার ফলে বর্তমান নানিয়ারচর উপজেলাধীন বড়াদম সাকিনের নীলচন্দ্র দেওয়ান নামক জনৈক পুলিশ অফিসারের পিতাসহ অসংখ্য চাকমা নিহত হয়। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তখন ব্যাপক অভিযান চালিয়ে এদের দমন করেন।

---

* চারণ কবি

চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, সে কারণে চাকমাদের অধিকাংশ আচার অনুষ্ঠান পুরোপুরি বৌদ্ধধর্মভিত্তিক। এমনকি মৃত সংকার এবং শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানেও ধর্মীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে এমন কিছু আচার অনুষ্ঠানও বেশ কয়েকটা দেখা যায়, যেগুলি বৌদ্ধ আদর্শের পরিপন্থী। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এককালে ধর্মের অবনতির যুগে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুদের তান্ত্রিক মতবাদের সাথে মিশে তন্ত্রযান, মন্ত্রযান, বজ্রযান ইত্যাদি নানা বিকৃত ধর্মের রূপ নেয়, আর সেই সঙ্গে হিন্দুদের বহু দেবদেবী ও হিন্দু আচার অনুষ্ঠান এই ধর্মে অনুপ্রবেশ করে। চাকমা ভাষার গাঙ্, গঙা, গঙ্গি ইত্যাদি শব্দ নদী অর্থে বুঝায়। আর চাকমাদের জলদেবীর নামও গঙা। এই সব শব্দ নিঃসন্দেহে গঙ্গানদী এবং হিন্দুদের গঙ্গাদেবীকেই নির্দেশ করে। হিন্দু ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত যে সব পূজা-পার্বণ চাকমা সমাজে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়, তার প্রায় সবগুলোতেই গঙা বা গঙ্গাদেবীর স্থান সর্বোচ্চ। এসব পূজায় পশুপাখী বলি দেওয়ার বিধান আছে। এতে মনে হয়, চাকমারা এককালে বোধ হয় গঙ্গার তীরবর্তী বা গঙ্গার কাছাকাছি কোন স্থানে বসবাস করত। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য কোন উপজাতির মধ্যে কিন্তু নদীকে গাঙ্, গঙা অথবা গঙ্গি বলা হয় না। এবিষয়ে চাকমাদের মধ্যে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, চাকমারা ক্ষত্রিয় এবং নেপালের শাক্যদেরই একটা দলছুট গোষ্ঠী। রাজা বিড়ুঢ়কের শাক্য নিধনের সময় কিংবা পরবর্তীতে বৌদ্ধ বিতাড়ন কালে নেপাল ছেড়ে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে ক্রমে ক্রমে আসাম হয়ে এখানে এসে পড়েছে। কথাটায় বোধহয় অনেকাংশে সত্য নিহিত রয়েছে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা ব্যাপার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম সার্ক সম্মেলন চলাকালে বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে একটা নেপালী ডকুমেন্টারী ফিল্ম সম্প্রচার করা হয়েছিল। কাহিনীর মুখ্য বিষয় বস্তু ছিল নেপালী জাতীয় বিচার পদ্ধতি। ছবিতে অপরাধীকে যেই সেই সামাজিক দণ্ড দেওয়া হয়েছিল বলে দেখানো হয়েছে যেমন,—দোষী ব্যক্তির মাথার চুল তিন ফালি করে কেটে দেওয়া, শুয়োরের খাঁচা কাঁধে নিয়ে ঢেঁড়া

পিটিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে নিজের নিজের অপরাধের কাহিনী বলতে বাধ্য করা,—ইত্যাদি সবই চাকমা জাতীয় বিচারে প্রযোজ্য দণ্ডের মতই হুবহু এক। তফাতের মধ্যে শুধু চাকমা অপরাধীকে এখন এখানে মুরগীর খাঁচা গলায় ঝুলানো বিধি। তবে সামাজিক খানার জন্য শুয়োর দণ্ড দেওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য।

চাকমা সমাজে যে সব পূজা অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তার মধ্যে অনেকগুলিই মানসিক পূজা। যেমন অহ্ইয়া, আহ্জার, বাত্তি, চামনী, চুমুলাং, ধর্মকাম, সিন্দি ইত্যাদি। বিপদে পড়লে প্রায় সবধর্মের লোকই বিপদ উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে হরহামেশা কিছু না কিছু মানত করে থাকে। বিপদ কেটে গেলে তারপর একসময় মানত শোধ করে। অনেকে পান তামাকও মানত করে এবং বিপদ কাটা না যাওয়া পর্যন্ত এসব জিনিষ স্পর্শ করেনা। এটা একরকমের ব্রতপালন। বৌদ্ধধর্মে এটাকে 'শীলব্রত পরামর্শ' বলে। এখানে চাকমাদের পাশাপাশি বহুদিন ধরে যদিও আরো বহু বিভিন্ন উপজাতির বসবাস চলছে, তাদের পূজা পার্বণের সাথে কিন্তু চাকমাদের আচার অনুষ্ঠানাদির খুব কমই মিল দেখা যায়। মালক্ষী মা পূজা এবং থান্‌মানা এই দু'টি মাত্র অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের সাথে কিছুটা মিল থাকলেও পূজা পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সার্বজনীন বিঝু উৎসব রূপেই পালিত হয়ে থাকে।

জাতির দুর্দ্দিনে ধর্মেরও অবনতি ঘটে, এটা স্বাভাবিক। এমনি অন্ধকার যুগেরই সাক্ষ্য বহন করে চাকমা সমাজের পুরোনো দিনের বৌদ্ধ পুরোহিতেরা, যাদের বলা হয় 'রুরি' বা 'লুরি'। এই শব্দটা বোধ হয় মধ্যযুগের রাউল বা রাউলী শব্দ থেকে এসেছে। বয়োবৃদ্ধেরা এদের আহ্বান করে থাকেন 'থর' বলে, যেটা খুব সম্ভব পালি 'থের' অর্থাৎ স্থবির শব্দের অপভ্রংশ। এরা মাথা মুড়োয়, পীত বসন পরে কাছা দিয়ে। কথিত আছে, সেই বৌদ্ধ বিতাড়নের যুগে প্রাণভয়ে পলায়নের সময় বৌদ্ধভিক্ষুরা

দ্রুত গমনের সুবিধার্থে কাছা দিতে বাধ্য হয়; আর তখন থেকেই এদের মধ্যে কাছা দিয়ে চীবর পরিধান করা চালু হয়ে যায়। ব্রহ্মচর্য এদের জন্য অপরিহার্য নয়। এরা বিয়ে করে সংসারী হতে পারে। অনেকে শুধু প্রয়োজনের সময় কাছায় ধারণ করে গৃহস্থ বাড়ী গিয়ে পূজাপাঠ সমাধা করে দিয়ে আসে। এদের ব্যবহার্য একমাত্র প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'আঘরতারা' চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালায় লিখিত। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সেই দুর অতীতে চম্পক নগরের যুবরাজ বিজয়গিরি যখন রাজ্য জয়ে বের হয়েছিলেন তখনও চাকমাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল এবং শিক্ষাদীক্ষার প্রতি তাদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। অভিযান যখন শেষ অর্থাৎ আরাকানের সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত যখন চাকমাদের জয় করা হয়ে গেছে সেই সময়কার গৃহ প্রত্যাগমনোন্মুখ সৈন্যদের গানে আছে,—

"পোর্বুয়া পন্দিত্ নেই যে দেজত্,
থেদং নয় ভেইলক্ সে দেজত।
যেই যেই ভেইলক্ ফিরি যেই,
সাপ্রেই কুলত্ ফিরি যেই।"

(পড়ুয়া পণ্ডিত নেই যে দেশে, থাকবোনা ভাইসব সে দেশে। চল চল ভাইসব ফিরে যাই, সাপ্রেই কুলে ফিরে যাই।) বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, শিক্ষার প্রতি এত অনুরাগ এত আকুলতা খুব কম জাতিতেই দেখা যায়।

আঘরতারা বৌদ্ধ সূত্র পিটকের অন্তর্গত কয়েকটা সুত্রের সমষ্টি মাত্র। ভাষা বিকৃত পালি এবং দুর্বোধ্য। চাকমাদের প্রচলিত কিংবদন্তী মতে এটা হওয়াই স্বাভাবিক। দেশত্যাগ কালেই আঘরতারা সঙ্গে আনা হয়েছিল এবং সুদীর্ঘ কাল ধরে এর পুনঃ পুনঃ অনুলিখন এর বিকৃতি ঘটার কারণ। অনেকে মনে করেন, চাকমারা ব্রহ্মদেশ, আরাকান ইত্যাদি জায়গায় এসেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে; কিন্তু সেক্ষেত্রে চাকমা ভাষার সঙ্গে সেসব দেশীয়

ভাষার কিছু না কিছু ঘটা ছিল অনিবার্য। আশ্চর্যের বিষয় যে, চাকমা ভাষায় ক্যং, স্যং, চাঙি, সাবেক এবং ওয়া এই কয়েকটি স্বগী শব্দ ছাড়া একটিও বার্মিজ শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং ভাষার আদান প্রদান যেখানে অনুপস্থিত সেখানে ধর্মের আদান প্রদান কী করে সম্ভব? ধর্মের পুনরুজ্জীবনের সাথে সাথে আঘরতারা এখন অপ্রচলিত এবং অবহেলিত হয়ে আছে। রুরি কিন্তু সমাজের আনাচে কানাচে এখনও দু' একজন দেখা যায়। তখনকার দিনে মৃত সৎকার ও শ্রাদ্ধাদি কাজ এবং বৌদ্ধধর্মভিত্তিক পূজা পার্বণ এদের পৌরহিত্যেই সম্পন্ন হত। এখন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের স্থান দখল করে নিয়েছেন।

বিয়েশাদী থেকে আর আর যাবতীয় সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে পৌরহিত্য করার জন্যে পূর্বোক্ত রুরিদের মত চাকমা সমাজে আরেক শ্রেণীর লোক রয়েছে। এদের বলা হয় 'অঝা'। অঝা আসলে বাংলা ওঝাই। তবে চাকমা সমাজে অঝা বলতে ধাইকেও বুঝায়, যে প্রসূতির গর্ভ খালাস করে থাকে। অঝারা তুক্‌তাক্ মন্ত্র জানে, পাহাড়ী চিকিৎসা বিদ্যায়ও তাদের কম বেশী দক্ষতা থাকে। অনেক রোগে এদের বনজ ঔষধ প্রায় অব্যর্থ। অনেক অঝা আবার ভালো সর্পবিদ্যা বিশারদ। এসব কারণে চাকমা ভাষায় অঝা আর বৈদ্য শব্দ দু'টি প্রায় সমার্থবোধক। চাকমা ধাই অর্থাৎ স্ত্রী অঝারাও বড় কম যায় না। তাদেরও শিশুরোগ, স্ত্রীরোগ প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকে। গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থান বুঝতে পারে। প্রসবের পক্ষে তেমন বিপজ্জনক মনে হলে হাতের কৌশলে গর্ভস্থ ভ্রূণের সঠিকভাবে সংস্থাপন করে সুপ্রসব করাতে জানে। এসব কারণে চাকমাদের মধ্যে প্রসবকালীন শিশুমৃত্যুর হার তুলনামূলক ভাবে কম। প্রতি পাড়াতে অভিজ্ঞ অঝা দু' একজন থাকে। বহু অভিজ্ঞতা যাদের থাকে 'রাজ অঝা' বলে তাদের নাম রটে যায়।

পুরুষ অঝাদের কিন্তু এখন খুব আকাল। সমাজে শিক্ষা সম্প্রসারণের

সাথে সাথে পুরোনো দিনের পূজাপাঠ এখন অনেক কমে গেছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক কারণেও এ সমস্ত পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা এখন আর বিশেষ সম্ভব হয়ে উঠেনা। তাই সমাজে অঝাদের সংখ্যাও খুব কমে গেছে। চাকমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে অঝাদের পৌরোহিত্য অপরিহার্য, সে কারণে এখনও এরা টিম্ টিম্ করে টিকে রয়েছে।

পূজা পার্বণে পশুপাখী বলি দেওয়ারও একটা নির্দ্দিষ্ট বিধি বিধান আছে। যে সমস্ত পূজায় বলির বিধান থাকে সেক্ষেত্রে বলি দেওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেবতা ভোগ নিতে রাজী আছেন কিনা 'আগ্ পাতা' ফেলে আগে ভাগে তা' যাচাই করা হয়ে থাকে। তুটো কাঁঠাল পাতার প্রস্থে মাঝামাঝি কেটে ল্যাজার অংশ তু'টো তর্জনী, মধ্যমা আর অনামিকার ফাঁকে রেখে দেবতার উদ্দেশ্যে তাঁর মতামত প্রার্থনা করে পূজাবেদীর উপর ছুঁড়ে দেওয়া হয়। পাতা তু'টোর যদি একটার সামনের দিক আর অপরটার পিঠের দিক উপরমুখী করে পড়ে, তবে বুঝা যাবে দেবতা ভোগ নিতে রাজী আছেন। তু'টি পাতাই যদি পিঠের দিক উপরমুখো হয়ে পড়ে, তবে বুঝতে হবে দেবতা নারাজ। আর যদি তু'টোরই সামনের দিক উপরমুখী হয়ে পড়েছে দেখা যায়, তবে ধরে নিতে হবে দেবতা চালাকী খেলছেন কিংবা ঠাট্টা জুড়ে দিয়েছেন। এই উভয় অবস্থাকে দেবতা যতক্ষণ না রাজী হচ্ছেন বার বার আগ্ পাতা ফেলা চলতে থাকে। বলি দেওয়ার সময় শূকর কিংবা হাঁস মুরগী ইত্যাদির শির ছিন্ন না করে শুধু কণ্ঠনালী ছিন্ন করে বধ করলে চলে। কিন্তু পাঁঠা, মোষ ইত্যাদি পশুর বেলায় এক কোপে মুণ্ডুটা বিচ্ছিন্ন করাই বিধি। ব্যতিক্রম ঘটলে ঘোরতর অমঙ্গল আশঙ্কা করা হয়ে থাকে। তখন একটির স্থলে ফের জোড়াবলি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান আছে।

পরিশেষে একটা কথা এই যে, পূজা পার্বণ একটা সমাজের জন্য শুধু কিছুটা আমোদ প্রমোদ বা কিছু পূজা অর্চনা এরূপ অর্থ বহন করেনা।

যে সমাজে যেই যেই আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকে, সেগুলি সেই সমাজের তথা সেই জাতির কুল প্রথা বা কুলাচার। এসবের ভিত্তিমূলে ধর্মীয় প্রভাব বা অন্যবিধ ভাবাদর্শ যাই থাকনা কেন, এগুলির যথাযথভাবে আচরণের মধ্য দিয়ে জাতীয় বৈশিষ্ট প্রকাশ পায়। জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষিত হয় এবং সর্বোপরি সমাজ জীবনে অখণ্ডতা ও সংঘবদ্ধতা বজায় থাকে। সংঘবদ্ধ ভাবে কুলধর্ম আচরণ করা স্বয়ং বুদ্ধ কর্তৃক প্রশংসিত। লিচ্ছবীদের সপ্ত অপরিহার্য্য ধর্মের এটি একটি অন্যতম ধর্ম। এখানে সর্বমোট পঁচিশ প্রকার চাকমা পূজা পার্বণের কথা তুলে ধরা হয়েছে; তবে এর কিছু কিছু তথ্য ইতিপূর্বে স্থানীয় সাপ্তাহিক বনভূমি পত্রিকায় ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮ ইংরেজী তারিখ থেকে ২৬শে মার্চ ১৯৭৯ ইংরেজী পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জ্বরজারি হলে চাকমা জননী সন্তানের রোগমুক্তির জন্য গঙা অর্থাৎ নদী বা ছড়ার জলে একমুঠি ভাত ছিটিয়ে দিয়ে আসেন। এই উদ্দেশ্যে একমুঠো ভাত এক টুকরো কলাপাতায় দিয়ে তাতে বাড়ীর চারকোণা আর মাঝের খুঁটি থেকে দা'ও দিয়ে কিছু চিলতে তুলে মেশানো হয়ে থাকে। তারপর রুগ্নছেলের মাথার উপর তা' ধরে ছেলের মা এই বলে প্রার্থনা করেন যে, আজ অমুকের অসুখ ভালো হওয়ার জন্যে ভাতজরা (মুঠিভাত) দিচ্ছি,—হে মা গঙা।* ছেলেকে ভালো করে দাও। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'নিঝিদনাহ্।' এরপর সেই মিশ্রিত ভাতগুলো ঘাটে নিয়ে পানিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

কারো যদি চোখ টাটায়, চোখ থেকে পিচুটি গলে, কারো গায়ে দাদ, খোস্‌পাঁচড়া ইত্যাদি চর্মরোগ দেখা দেয়, তবে তারও প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে অনেকে গঙায় ভাতজরা দিয়ে থাকে। এ সময় ভাতের সঙ্গে আর কিছু মেশাতে হয় না।

* এখানে গঙা জলদেবী অর্থে

হয়ে পরস্পর মিলন ইচ্ছায় একসাথে গঙার ভাতজরা দিয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রেমিক যুগলের মুখে উভাগীত জুড়ে দেওয়া হয়েছে,—

"দিলং ভাত্তজরা গঙা-রে,
মলেহ্ মরিবং সমারে।"

(গঙাকে ভাতজরা দিলাম। প্রার্থনা করি, আমরা মরি তো যেন একসাথে মরি। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত কেউ যেন আমাদের পৃথক করতে না পারে।)

আগেকার দিনে নিষ্ঠাবতী চাকমা গৃহিনীরা সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতিবার বাড়ীতে একটি সিদ্ধ ডিম আর সাধারণ ভাত তরকারী দিয়ে মালক্ষ্মী মার পূজা দিত। বিশেষত: কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে কোন বুড়ী তার বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে, তাহলেতো কথাই নেই। পরদিন মালক্ষ্মী মার পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। বলাবাহুল্য, মালক্ষ্মী মা হলেন হিন্দুদের লক্ষ্মীদেবী। ধান 'ফাও' করার সময় এবং নবান্ন উৎসব কালেও মালক্ষ্মী মার পূজা অবশ্য করণীয়। মালক্ষ্মী মার প্রিয় ভোগ হল ভাডুই পাখী। অভাবে শূকর, মোরগ এমনকি কাঁকড়াও হলেও চলে। তা'ছাড়া মদতো আছেই। মজার কথা, হিন্দুদের নিরামিষাশী লক্ষ্মীদেবী চাকমাদের হাতে পড়ে মদ মাংস সবই ধরেছেন। সকালবেলা সকলের আহারের আগে মালক্ষ্মী মার ভোগ দিতে হয়। এর জন্য কোন অঝার দরকার পড়েনা। বাড়ীর গৃহিনীই স্নানান্তে শুদ্ধ শুচি হয়ে মাথায় 'খবং'* জড়িয়ে পূজার চারধারে কিছু চাল আর জল ছিটিয়ে দেবীকে আবাহন করে ভোগ নিবেদন করে থাকে। আগেকার দিনে যখন বাক্স প্যাঁটরার যুগ আসেনি তখন প্রত্যেক চাকমা গৃহস্থের ঘরে দু'একটা

---

* ধান কাটা বউনী।

* পাগড়ির মত মাথায় জড়ানোর জন্য এক প্রকার খাটো বহরের নাতিদীর্ঘ কাপড়।

'ফুল বারেং'* থাকত। তারি একখানা ডালায় কলা পাতার আগার অংশটা দিয়ে মালক্ষ্মী মার ভোগ সাজানো হত। সাধারণ ভাত তরকারীর সাথে তাতে কমপক্ষে একটি সিদ্ধ ডিম আর মুরগী জবাই হলে তার মাথা, ঘিলা কলিজা ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে। পূজা শেষে গৃহিনী আবার আগের প্রক্রিয়ায় চাল আর জল ছিটিয়ে দেবী বন্দনা করে পূজার উপকরণগুলো তুলে নিয়ে আসে। এগুলো বিশেষ করে বাড়ীর আদুরে ছেলের ভাগেই পড়ে। মালক্ষ্মী মার পূজায় পশুপাখী বলি দেওয়া হলে তখন কিন্তু অঝার পৌরোহিত্য দরকার হয়ে থাকে।

চাকমা লোকায়ত সাহিত্যে লক্ষ্মীপালা নামে একটা পালাগান আছে। চাকমা সমাজে মালক্ষ্মী মার পূজা কি করে স্থান পেয়েছে তার একটা হদিস এখানে পাওয়া যায়। প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস মতে সৃষ্টিকর্তাকে চাকমারা 'গোজেন' গোঁসাই ?) বলে থাকে। সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে গোজেন্ মানুষ পয়দা করেন, একজন দুজন নয়, বহুজন। তাদের মুখে তখনও যখন বোল ফুটেনি তখন,—

"কলহ্ গোজেন মানেই মাত,
মানেই মাদিলাক্ গোজেন্ ভাত।

(গোজেন বললেন, 'মানুষেরা কথা কও'। মানুষেরা বলল,— "হে গোজেন! আমাদের ভাত দাও অর্থাৎ আমরা ক্ষুধার্ত।) কিন্তু পৃথিবীতে তখন কোথায় ভাত? তখন,—

"ভাদজ মালিক মালক্ষ্মী,
স্বর্গত এলঅ তার বসত্তি।"

---

* একপ্রকার ঝাঁপি বিশেষ, উচ্চতার ৩/৪ ফুট, নীচের দিকে চারকোণার চারটি অমুক বেতের পায়া থাকে। উপরের ডালাটা মন্দিরের চূড়ার আকারে নির্মিত।

ভাতের মালিক মা লক্ষ্মীর বসতি তখন স্বর্গে। এখন মানব কুলকে খাওয়াতে হলে লক্ষ্মীকে তবে আনতে হয় স্বর্গ থেকে ; কিন্তু কে যাবে? প্রথমে গেল * কালাইয়া। সে কিন্তু লক্ষ্মীর আবাসে গিয়ে লক্ষ্মীর আতিথেয়তায় পড়ে বেশী মদ ভাং খেয়ে আবোল তাবোল বকতে শুরু করে দিল,—

"দিঝা আহ্‌রেইয়ে মদ ভাং খেই,
খাক্‌কে দাগে মা খাক্‌কে বেই।
রাগে তারে লক্ষ্মী কয়,—
পাগলঅ সমারে যেত্তুং নয়।"

(কালাইয়া মদ ভাং খেয়ে দিশাহারা হয়ে লক্ষ্মীকে কখনও ডাকে মা আর কখনও ডাকে দিদি। লক্ষ্মী রাগে বললেন,—'এ পাগলের সঙ্গে যাবো না।)

এদিকে কালাইয়ার ফিরতে দেরী দেখে মনুষ্যকুলে হাহাকার পড়ে গেল। স্বর্গপুরে এখন কে যাবে খবর নিতে? লোকের দুর্দ্দশা দেখে বিয়াত্রা** তখন বলল,—

"গঙা পূজি আগে ভুগ্,
দিবানি মরেহ্ মানেইলুক্?
যানি তুমি খাম খেলে,
লক্ষ্মী খজা মুই যেম সালে।"

(হে লোক সকল, তোমরা যদি সত্য কর যে গঙাদেবীর পূজার আমাকেই আগে ভোগ নিবেদন করবে তাহলে আমি লক্ষ্মী আনতে যাব) সকলে তাতে রাজী হয়ে গেলে বিয়াত্রা তখন স্বর্গে গিয়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে

---

* চুমুলাং পূজার অন্যতম দেবতা, পরমেশ্বরী দেবীর প্রথম স্বামী।
** গঙা দেবীর স্বামী।

আসে। সে আরেক দীর্ঘ কাহিনী। লক্ষ্মী এলে তখন পৃথিবীতে লোকের অন্নাভাব ঘুচলো। তবে লক্ষ্মীতো আর চিরকাল স্বর্গ ছেড়ে থাকতে পারেন না, তাই ফিরে যাবার আগে তিনি বলে দিয়ে গেলেন কি ভাবে তাঁকে পূজা করলে দিন দিন লোকের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। —

"এগামনে গরি স'র
পত্তি সাপ্তা বৃস্যুত্ বার,
ধানে চোলে সাজেবাক্,
বাডে মারি ভাত দিবাক্।
আগ্ পাদালৈ আগ্ চেলে,
যানি বাডে ন পেলেহ্,
কুরাহ্ শুগর্ আর মদ,
ভক্তিয়ে মনেহ্ দিবা ভাত।
ইয়ানিয়্য যে ন পেবঅ,
কাঙারালৈ তে পুজিবঅ।
পুজে যে জনে মন ভক্তি,
তা ঘরত্ অহ্‌ব ম বসত্তি।
ধনে সোম্মোদে মন পুরা।
ভাদে কাবরে সব পুরা।
কলহ্ একথা মালক্ষী,
দিন দিন উধিব তা গিরিত্তি।"

(সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতিবার ধান চাল দিয়ে পূজা সাজিয়ে ভাতুই মেরে একাগ্রমনে আমাকে ভোগ দেবে। ভাতুই যদি পাওয়া না যায়, মোরগ অথবা শূকরের মাংস আর মদ দিয়ে আমার ভোগ নিবেদন করবে। এসবও যে যোগাড় করতে পারবেনা শুধু কাঁকড়া দিয়ে সে আমার পূজা দেবে। ভক্তিযুক্ত মনে যে আমার পূজা করে, আমার বসতি হবে তারই ঘরে। মনোমত ধন সম্পদ, অন্ন-বস্ত্র কিছুই তার অপূর্ণ থাকবে না। মা'লক্ষ্মী বললেন, দিন দিন তার সংসারে শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

নুয়া ভাত

নুয়া ভাত বাংলায় নবান্ন উৎসব। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা যায় নবান্ন অনুষ্ঠান বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্ব কাল থেকেই ভারতে প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ কৃষিজীবি মাত্রেরই জীবনে এ'টি বার্ষিক উৎসব। একজন চাকমা জুমিয়া বা কৃষিজীবি নবান্ন উৎসবের পূর্বে নতুন ফসলের অন্ন মুখে দেয়না। নবান্ন উৎসবের সময় মালক্ষ্মী মার পূজা করা হয় এবং সামর্থ্য মতে পাড়ার পাঁচজনকে খাওয়ানো হয়ে থাকে। সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরে এ উপলক্ষে মালক্ষ্মী মার পূজায় শূকর উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। কারো জুমে কিংবা ধানক্ষেতে যদি "মেমে ছাগলী" পাখী বাসা বাঁধে তবে শূকর বলি দিয়ে ঘটা করে মালক্ষ্মী মার পূজা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এই পূজার সময় 'মেমে ছাগলীর' বাসা থেকে গৃহস্থ বাড়ী পর্যন্ত পথের দু'ধারে সাতগাছি করে সূতা টেনে সংযোগ সাধন করতে হয়, যার ভাবার্থ হলো মালক্ষ্মীকে ঘটা করে গৃহে বরণ করে তোলা। এটা অনেকটা রাস্তার দু'ধারে অভ্যর্থনা জানানোর মত। 'মেমে ছাগলী' একটি অতি ক্ষুদ্র পাখী। এরা ধান গাছেও বাসা বাঁধতে পারে। হিন্দুদের যেমন লক্ষ্মী প্যাঁচা এই পাখীটাকেও তেমনি চাকমারা লক্ষ্মীর আশ্রিতা বলেই গণ্য করে থাকে।

চামনী

মরণাপন্ন ছেলের আরোগ্য কামনায় অনেক সময় চাকমা জনক জননী ছেলের জন্য চামনী মানত করে থাকেন। চামনী পালি সামঞ্ঞ্য বা শ্রামণ্যব্রত। ছেলে ভাল হয়ে গেলে একদিন ঘটা করে তাকে বিহারে নিয়ে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত করা হয়ে থাকে। এভাবে সে রংবস্ত্র নিয়ে অন্তত: সপ্তাহকাল বিহারে অবস্থান করে এবং বিহারবাসী ভিক্ষুর নিকট শ্রামণ্য

ধর্মের পাঠ নিয়ে ব্রত পালন করে। এসময় ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ করাই নিয়ম। ব্রত পূরণের জন্য অন্ততঃপক্ষে একদিন দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হয়। বৌদ্ধধর্মে এরূপ ব্রতধারী শিক্ষার্থীকে বলা হয় শ্রামণের। সপ্তাহান্তে সে আবার চীবর পরিত্যাগ করে মা বাবার সঙ্গে গৃহে ফিরে আসে। তখন এ উপলক্ষে ভিক্ষু ভোজন সহ লোকজন খাওয়ানো হয়ে থাকে।

অনেক সময় অনেক বয়স্ক ব্যক্তিও বিপদে পড়ে চামনী মানত করে। তারপর বিপদ কেটে গেলে এক সময় বিহারে গিয়ে মানত শোধ করে দিয়ে আসে। পুরোপুরি ভিক্ষুজীবন গ্রহণের জন্য যারা দীক্ষা নেয় তারা বিহারেই থেকে যায় এবং শিক্ষা সমাপনান্তে উপসম্পদা লাভ করে। চাকমা সমাজে জীবনে অন্ততঃ একবার, বিশেষতঃ বিবাহের পূর্বে বিহারে গিয়ে কিছুদিনের জন্যে শ্রামণ্য ব্রত পালন করা প্রত্যেক পুরুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এর প্রায় বিশেষ কোন হেরফের হয়না। শীল পালন এবং ব্রহ্মচর্য্য আচরণের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্মের নীতিশিক্ষা গ্রহণই এই প্রথার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সাময়িক ব্রত পালনের জন্যও অন্ততঃ পক্ষে সপ্তাহকাল বিহারে অবস্থান করা আবশ্যক।

চুমুলাং

যখনই কোন চাকমা বিপদে পড়ে তখন বিপদ মুক্তির জন্য 'চুমুলাং' মানত করে। দুর্যোগ কেটে গেলে তখন সে ঘটা করে চুমুলাং পূজা করে। চুমুলাং আসলে বিয়ের পূজা। এই পূজায় একজন দেবী আর দুজন দেবতার পূজা করতে হয়। দেবীর নাম পরমেশ্বরী আর দেবতাদের একজনের নাম কালাইয়া। অপর দেবতার নাম শাস্ত্রে বলা হয়নি, তাই একে শুধু 'নেইনাঙ্গ্যা' অর্থাৎ অনামী বলা হয়ে থাকে। এই দেবদেবীগণ আবার

সর্বসিদ্ধি দাতারূপেও বিবেচিত হন। আগেকার দিনে তাই প্রায় গৃহস্থই সম্বৎসরে একবার গৃহ দেবতার পূজার মত চুমুলাং পূজা করত। এজন্য এই পূজাকে অনেকে 'ঘর ভাঙা' বলে থাকে। এটা অনেকটা বিবাহ বার্ষিকী উদযাপনের মত যদিও ঠিক বিয়ের দিনে এটা করা হয়না।

চুমুলাং পূজার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ কাহিনী আছে। স্মরণাতীত কালে চাকমাদের মধ্যে বোধ হয় বিয়ের সময় চুমুলাং পূজা করা কিংবা লোকজন খাওয়ানোর রেওয়াজ ছিলনা। উপরোক্ত দেবতা কালাইয়া এই প্রথার প্রবর্ত্তক যিনি পরমেশ্বরী দেবীর প্রথম স্বামী। কথিত আছে পরমেশ্বরী দেবীকে বিয়ের পর কালাইয়া বানিজ্যোদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেন। এজন্য কালাইয়াকে সওদাগরও বলা হয়ে থাকে। কথা থাকে যে, বার বৎসরের মধ্যে যদি কালাইয়া ফিরে না আসেন তবে পরমেশ্বরী দেবী এর পরে স্বেচ্ছায় দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবেন। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সেই দুর অতীতে চাকমারা বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য করত। কালাইয়া অবশ্য দৈবগতিকে ঠিক সময়ে ফিরতে পারেন নি আর পরমেশ্বরী দেবীও বার বছর গতে আর একজনকে বিয়ে করে ফেলেন। এর পর কালাইয়া ফিরে এসে দেখতে পান যে, স্ত্রী বেহাত হয়ে গেছে। তখন তিনি চুমুলাং পূজা করে লোকজন খাইয়ে এবং সম্ভবতঃ তাদের মতামত নিয়েই স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন সেই থেকে বিয়ের সময় চুমুলাং পূজা করা আর লোকজন খাওয়ানো চাকমা সমাজে চলতি হয়ে গেল। কালে কালে উপরোক্ত তিনজনও এই পূজায় দেব দেবীর আসনে কায়েম হয়ে গেলেন। এখন আর চুমুলাং না করলে বিয়ে সিদ্ধ হয়না। আর যেন তেন প্রকারের একটা বিয়ের খানা দিতে হবেই। অন্যথায় সেই লোকের মৃত্যু হলে তার মড়া কাঁধে না তুলে হাঁটুর নীচে ঝুলিয়ে অসম্মান জনকভাবে শ্মশানে নেওয়াই বিধি।

চুমুলাং পূজায় মদ, তিনটি মুরগী, বাচ্চা হলেও ক্ষতি নেই, অধিকন্তু

একটি শূকর লাগে। অভাব পক্ষে শুধু তিনটি মুরগীর বাচ্চা হলেও চলে। অঝা বা পুরোহিত ঘরের মধ্যে চাটাইয়ের উপর কিছু ধান, চাল, কার্পাস ইত্যাদি দিয়ে পাশাপাশি দু'টো পূজা সাজায়। সামনে এক একটি সরষে তেলের পিদিম জ্বলে। তারপর পূজার শূকর এবং মুরগীগুলো বলি দিয়ে অঝা সেগুলোর মাথা এবং রক্ত মদ্য পানীয় সহযোগে পূজায় নিবেদন করে। অঝার পূজাপাঠ শেষ হলে স্বামী স্ত্রী জোড়ায় এসে পূজা প্রণাম করে। এই পূজায় সিদ্ধ অবস্থায় দ্বিতীয়বার ভোগ নিবেদন করতে হয়। এই শেষবার ভোগ দেওয়ার পর অঝা আর পাড়ার বুড়োরা মিলে পূজার ফলাফল নিয়ে আলোচনায় বসে। এই সময় ভোগের জন্য নিবেদিত সিদ্ধ ডিম মুরগীর ঠ্যাং, মাথা ইত্যাদি নিয়ে অঝা দম্পতির ভবিষ্যত শুভাশুভ বিচারে প্রবৃত্ত হয়। এই পূজা মানসিক করা পূজা হলে তা' দেবতার সন্তুষ্টি বিধান করে ভালভাবে উত্রে গেল কিনা তাও নিরূপণ করা হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'চাম্বা চানাহ্'।

অহ্ইয়া

অপুত্রক ব্যক্তি কামনায় অথবা অনেকগুলো পুত্র সন্তানের পর একটি মেয়ে সন্তান পাওয়ার বাসনায়, আর্থিক সমৃদ্ধি কিংবা উপস্থিত কোন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য লোকে এই পূজা মানত করে থাকে। যদি মানস পূর্ণ হয় তখন সে ঘটা করে এই পূজার অনুষ্ঠান করে। এই পূজার বিশেষত্ব এই যে, অতঃপর যতদিন সামর্থ্যে কুলায় সে প্রতি বৎসর এই পূজা করতে বাধ্য থাকে। যখন সামর্থ্য চলে যায় তখন সে দেবতাদের কাছে মাপ চেয়ে পূজার ইতি টানে।

এই পূজাটা একটা মিশ্রিত বিশ্বাসের অনুষ্ঠান। এতে একাধারে চাকমা, ত্রিপুরা এবং মুসলমানী ধর্ম বিশ্বাসের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে।

এই পূজায় অহ্‌ইয়া, গরেইয়া এবং গাজী এই তিনজন দেবতার পূজা করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে অহ্‌ইয়া চাকমাদের, গরেইয়া ত্রিপুরাদের আর গাজী মুসলমান ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক। এই পূজার জন্য প্রথমে উঠানের একপাশে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় একটা বড় বাঁশের চোঙা, ভিতরে একটা ডিম ঢুকিয়ে, মাটিতে পোঁতা হয়ে থাকে। তারপর পতাকা দণ্ডের মত দীর্ঘ একটি বাঁশের দণ্ড আস্তে করে চোঙার ভিতর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে খাড়া করানো হয়। ঐ দণ্ডে নতুন নতুন খাদি, যেগুলো চাকমা মেয়েরা বুকে জড়িয়ে বাঁধে, সারি সারি ঝুলানো হয়ে থাকে। গৃহস্থ যত বছর এই পুজা করে, অনুক্রমে এই কাপড়গুলোর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে এই কাপড়গুলোর সংখ্যা গুণে যে কেউ বলে দিতে পারে গৃহস্থ কত বছর ধরে এই পূজা করে আসছে। পূজা শেষে কাপড়গুলো সযত্নে তুলে রাখা হয় পরের বছরে ব্যবহারের জন্য। বাঁশের দণ্ডটি নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

এই পূজায় নয়টি মুরগী লাগে। তন্মধ্যে কমপক্ষে একটি মোরগ হওয়া চাই। অধিক সঙ্গতি থাকলে এই পূজায় পাঠাও বলি দেওয়া হয়ে থাকে। অঝা বা পুরোহিত আগ পাতা ফেলে পূর্বোক্ত দণ্ডটির গোড়ায় এগুলি বলি দেয়। পূজা শেষে বলির মাংস রান্নাবান্না করে নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গসহ মদ্যপানের ভিতর দিয়ে ভুরিভোজ চলে।

সিন্দি

অনেকদিন আগে সিন্দি পুথি বা সত্যনারয়ণের পাঁচালী নামে একটা পুঁথি বাজারে কিনতে পাওয়া যেত। পঞ্চাশের দশকে স্বর্গীয় হর কিশোর চাকমা এর অনুকরণে ভগবান বুদ্ধের সত্য পারামীকে ভিত্তি করে সত্যের পাঁচালী নামে আরেকটি পুঁথি রচনা করেন। এটাও আর এখন পাওয়া

যায়না। চাকমা ভাষায় সিন্দি বাংলায় শির্‌নী। তখনকার দিনে চাকমাদের প্রায় ঘরে ঘরে হিন্দুদের দেখাদেখি সত্য নারায়ণের নামে শির্‌নী দেওয়া হত। মুসলমান সমাজেও তখন এ ধরণের একটা শির্‌নী দেওয়ার রেওয়াজ ছিল, আর তা' উৎসর্গ করা হত সত্য পীরের নামে। সত্য নারায়ণ আর সত্যপীর যেই হউন, উভয়ে তখন খুব জাগ্রত দেবতা বলে বিবেচিত হতেন। সন্ধ্যাকালে কিংবা এঁটোমুখে ভুলেও কেউ কখনও এই শির্‌নীর নাম মুখে আনতে সাহস করতো না। অকারণ এই পূজার কথা নিয়ে তোলাপাড়া করলে কিংবা শির্‌নী নিয়ে কেউ কখনও সামান্যতম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করলে তখন নাকি সত্যি সত্যি কোন না কোন বিপদ দেখা দিত। হয়তঃ জঙ্গলে বাঘের উপদ্রব দেখা দেবে। পাড়া গ্রামে ওলাউঠা, বসন্ত ইত্যাদির মড়ক লেগে যাবে; নিদেনপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশেষ কিংবা তার পরিবারের কারো না কারো প্রাণ হানি ঘটতে পারে।

নানা কারণে তখন লোকে শির্‌নী মানত করত। বিবিধ রকমের বিপদমুক্তি, জীবনাশঙ্কা, বৈষয়িক সমৃদ্ধি এমন কি ক্ষেতে পোকা মাকড়ের উপদ্রব নিবারণের জন্যও লোকে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের নামে শির্‌নী দিত। তবে বাঘের উপদ্রব নিবারণেই নাকি এই পূজার বিশেষত্ব। বিপদের গুরুত্ব অনুসারে লোকে একসঙ্গে একাধিক শির্‌নীও মানত করত। পুঁথির ভাষায় এই পূজার জন্য,—

'সোয়াসের দুগ্ধ লাগে সোয়াসের আটা,
সুপক্ক কদলী লাগে সোয়াসের মিঠা।'

তা' ছাড়া আধ' নারিকেল, পান সুপারী এবং বিবিধ প্রকার কুসও লাগে। তুলসী এই পূজায় অপরিহার্য। একাধিক পূজা হলে সম পরিমাণ উপকরণ দিয়ে আলাদা আলাদা পূজা পাশাপাশি সাজাতে হয়। পূজার সময় প্রত্যেকটা পূজার শিয়রে এক একটা পিদিম জ্বলে আর লেখাপড়া জানা একজন লোক ব্রাহ্মণের ভূমিকা নিয়ে সুর করে পুঁথি পড়তে থাকে। এই সময় গৃহস্থ এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ পূজায় কিছু না কিছু দক্ষিণা দিয়ে

থাকে। পূজায় প্রদত্ত পান সুপারী এবং এইসব দক্ষিণার পয়সা পুঁথি পাঠকারী ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য। পূজা শেষে দুধ, আটা, গুড়, কলা, নারিকেল ইত্যাদি একটা বড় পাত্রে নিয়ে শির্‌নী মাখানো হয়ে থাকে। তারপর গৃহস্থের জন্য পরিমাণমত কিছুটা শির্‌নী রেখে দিয়ে বাকীটা পড়শীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হয়। খাওয়ার আগে শির্‌নী প্রথমে মাথায় নিতে হয়। এই সময় শির্‌নী খাওয়ার জন্যে পাড়ার ছেলে পিলেদের মধ্যে এমন কাড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি লেগে যায় যে, তাই নিয়ে চাকমাদের মধ্যে একটা বাগ্‌ধারাই চালু হয়ে গেছে,—'সিন্দি খিয়া গুরাগুন্' অর্থাৎ কিনা শির্‌নী খেকো বাচ্চারা। এই শির্‌নী যেখানে সেখানে ফেলা বারণ। উচ্ছিষ্ট সব কিছুই নদীতে দিয়ে আসতে হয়।

মুসলমান সমাজে শির্‌নী সিদ্ধ করে খাওয়া হয়ে থাকে। চাকমাদের মধ্যে কিন্তু কাঁচা খাওয়াই বিধি। ব্যাপারটা যদিও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্মত নয় তবু এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে শির্‌নী খেয়ে কারো কোনদিন সামান্যতম পেটের অসুখ করেছে, এমনটি কখনও শোনা যায়নি।

চাকমা ভাষায় সিন্দি নিয়ে মোট তিনটি বাগ্‌ধারা পাওয়া যায়।

যেমন,—১। 'সিন্দি খিয়া গুরাগুন, যেটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২। 'মানিক্যা বাবর সিন্দিখানা'—অর্থ, মানিকের বাবার শির্‌নী খাওয়া। অর্থাৎ যখন সে শির্‌নী খেতে গেল কিছুই আর তখন অবশিষ্ট নেই। এরূপ দেরী করা যাদের স্বভাব, ইংরেজীতে তাদের বলা হয়, 'Late Latif'।

৩। 'সিন্দিকলা'—অর্থাৎ শির্‌নী পূজায় দেওয়া খোসা ছাড়ানো কলার মত একেবারে উদোম গা।

ফানাচ্ বাত্তি

চাকমারা বিশেষ বিশেষ বৌদ্ধ পর্বদিনে ফানাচ্ বাত্তি উড়িয়ে দেয়। ফানাচ্ বাংলায় ফানুস। একে আকাশ প্রদীপও বলা হয়ে থাকে। ফানুস উড়িয়ে দেওয়া বৌদ্ধদের এক ধরণের প্রদীপ পূজা। কথিত আছে, রাজ-কুমার সিদ্ধার্থ যখন গৃহত্যাগ করে আনোমা নদীর তীরে উপস্থিত হন তখন তখন প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য স্বহস্তে অসি দিয়ে নিজের ভ্রমর কৃষ্ণ কেশরাজি ছেদন করেন। মহাব্রহ্মা সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি মাটিতে পড়ার আগে স্বহস্তে গ্রহণ করে ব্রহ্মালোকে নিয়ে যান এবং সেখানে সেই চুল নিয়ে 'চুলামণি চৈত্য' নামে একটি চৈত্য স্থাপন করেন। চাকমারা, তথা সমগ্র বৌদ্ধ জগত ফানাচ্ বাত্তি অর্থাৎ আকাশ প্রদীপ জ্বেলে সেই চুলামণি চৈত্যের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করে থাকে।

আহ্জার বাত্তি

বিপদমুক্তি কিংবা রোগ মুক্তি কামনায় লোকে আহ্জার বাত্তি মানত করে। এ'টি আসলে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রদীপ পূজা। এই অনুষ্ঠান বৌদ্ধ বিহারে কিংবা স্বগৃহে সম্পন্ন করা যায়। আগেকার দিনে পুরোনো বৌদ্ধ পুরোহিত রুরিরাই এই পূজায় পৌরোহিত্য করতেন। এই অনুষ্ঠানে আহ্জার বাত্তি অর্থাৎ এক হাজার বাতি জ্বালিয়ে বুদ্ধের পূজা করা হয়ে থাকে। এতে এক হাজার মোমবাতি অথবা ছোট ছোট মাটির চাটির উপর সলিতা দিয়ে এক হাজার সর্ষে তেলের পিদিম জ্বালানো হয়ে থাকে। চাকমারা এইরূপ পিদিমকে বলে 'এইচাদি'। স্বগৃহে এই পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হলে প্রথমে বাড়ীর প্রাঙ্গণে খোলা জায়গায় চতুষ্কোণ

আকারে একটা পূজা মণ্ডপ তৈরী করে নিতে হয়। তার চারধারে জোড়ায় জোড়ায় খুঁটি পুঁতে বেশ কিছু বাঁশ লম্বালম্বি দুই ফালি করে চিরে সেগুলো খুঁটিগুলোর ফাঁকে প্রস্থাকারে এমন ভাবে সারি সারি বেঁধে দেওয়া হয়, যা'তে প্রত্যেকটা বাঁশের ফালির খাঁজযুক্ত অংশটুকু উপরমুখো হয়ে থাকে। তারপর সেই খাঁজের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি অথবা 'এইচাদি' অর্থাৎ সর্ষে তেলের পিদিম বসিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ সন্ধ্যারাত্রে এই হাজার বাতি জ্বালানো হয়ে থাকে। তখন গৃহস্থ পরিজন ছাড়া বহু পাড়া প্রতিবেশী এ কাজে অংশ নিতে আসে এবং বাতি জ্বালানো কাজে সরিক হয়ে পুণ্যাংশ গ্রহণ করে থাকে। অনেকে এই অনুষ্ঠানের সময় দুয়েকটা ফানুসও উড়িয়ে দেয় এবং অনেক গৃহস্থ পরদিন ভিক্ষু ভোজনের সঙ্গে লোকজনও খাওয়ায়।

ধর্মকাম

এই পূজার একাধিক নাম, যেমন,—ধর্মকাম, আদিপূজা, শিবপূজা, সীবলী পূজা ইত্যাদি। আসলে এটা বুদ্ধশিষ্য লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী মহাস্থবিরের পূজা। এই পূজা এখন বৌদ্ধশাস্ত্র সম্মতভাবে বিহারে অথবা স্বগৃহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মের চরম অবনতির যুগে মহাযানী বৌদ্ধ মতবাদের সাথে যখন হিন্দুদের তান্ত্রিক মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটে তখন এই পূজা অনুষ্ঠানেও বিকৃতি দেখা দেয়। সীবলী পূজা হয়ে যায় শিবপূজা। ক্রমে ক্রমে বলিদান প্রথাও এই পূজায় চলতি হয়ে পড়ে। তবে এই পূজা অনুষ্ঠানে যথাস্থানে বুদ্ধমূর্তি সংস্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য। বছর সতের আগে ১৯৭০ ইংরেজীর শেষভাগে ১০৩ নং বাকছড়ি মৌজার বড় কাটাছড়ি গ্রামে স্বর্গীয় দুলাল দেওয়ানের গৃহে আমার একবার এরূপ এক পূজা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। পূর্বোক্ত বৌদ্ধ পুরোহিত রুরিদের পৌরোহিত্যেই কেবল এই পূজা সম্পন্ন হতে পারে। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'আঘরতারা' আবৃত্তিও

এখানে অপরিহার্য। তাছাড়া এই পূজায় এমন কতকগুলো বিধিবিধান রয়েছে যার মূলে নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ মতাদর্শ নিহিত রয়েছে। যেমন পূজার সময় গৃহস্থের ঘরে কিংবা পূজা মণ্ডপে শুচি শুদ্ধ না হয়ে কেউ প্রবেশ করতে পারেনা। আর যতক্ষণ না পূজা শেষ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মদ, জগড়া প্রভৃতি নেশাপান প্রত্যেকের জন্য নিষিদ্ধ থাকে। এসব বিধি বিধান কোনটার বরখেলাপ ঘটলে পূজায় বিপর্যয় ডেকে আনে।

অতি বিপদে পড়ে লোকে ধর্মকাম মানত করে। সিন্দির মতই এই ধর্মকামও বাসি মুখে মুখে আনতে নেই। সাধারণতঃ যখন জুমের ধান তোলা হয়, কাজকর্ম কমে আসে, এরূপ প্রশস্ত সময়ে একটা শুভদিন দেখে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। এতে পাড়ার সবাই যেমন নিমন্ত্রিত হয়ে থাকে তেমনি একাজে সবার সক্রিয় সাহায্যও পাওয়া যায়। পূজার ৭টি মোরগ মুরগী, ১টি শূকর, প্রচুর শুঁটকি মাছ আর বিবিধ রকমের তরিতরকারী লাগে। অনেকে মানত করার দিনই নিজের পালের একটা শূকরের বাচ্চাকে পূজার জন্য নির্দ্ধারিত করে খাসী করে দেয়। সেটা বড় হতে থাকে আর গৃহস্থও ধীরে ধীরে তৈরী হতে থাকে পূজার জন্য, যেহেতু এটা খুবই ব্যয় বহুল ব্যাপার। এই পূজার জন্য নিয়ত করে আগে ভাগে আলাদাভাবে মদ এবং বিশেষতঃ জগরা অর্থাৎ বিন্নিধানের অপরিস্রুত মিষ্টি মদ বানানো হয়ে থাকে। চাকমাদের বিশ্বাসমতে এভাবে পূজার জন্য বানানো মিষ্টি জগরা দীর্ঘদিন রেখে দিলেও কিছুতে টকে যেতে পারেনা।

এই অনুষ্ঠানের দু'টি পর্যায় রয়েছে। দু'টি দু'দিনে সম্পন্ন করতে হয়। প্রথম দিন পিঠা খাওয়া আর দ্বিতীয় দিনে আসল পূজা। পিঠা খাওয়া পরবের জন্যে তেলেভাজা ও ভাপে সিদ্ধ উভয় প্রকারের হরেক রকম চাকমা পিঠা প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা হয়ে থাকে। পিঠা খাওয়ার দিন সন্ধ্যাবেলা অনেকে আবার আহ্জার বাত্তিও জ্বালিয়ে থাকে, ফানুস ওড়ায়। তবে সেটা মানত করা নিয়ে কথা।

পিঠা খাওয়ার পর সে রাত্রের মধ্যেই মুরগী, শূকর ইত্যাদি বধ করে আর শুঁট্‌কি এবং অন্যান্য সব তরিতরকারী কুটনো কুটে নিয়ে পরদিন ভোরে ভোরে পূজার জন্য রান্না চাপানো হয়ে থাকে। রুরিরা বলে থাকেন, মোরগ মুরগী এবং শূকর শিবের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করা হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয় যে, অন্যান্য পূজার মত এগুলো বলি দেওয়ার পূর্বে আগ্‌-পাতা ফেলে কোন দেবতার মতামত চাওয়া হয়না। মোরগ মুরগীতেও কোন বাছবিচার নাই। ইত্যাদি কারণে স্বভাবতঃই এই পূজার বলির বিধান নিয়ে প্রশ্ন জাগে।

রান্না করতে হয় বাড়ীর বাইরে কোন সুবিধাজনক স্থানে। পূজার জন্য প্রথমে বাড়ীর উঠানে ৫ | ৭ জন লোক বসতে পারে মত একটা বাঁশের মাচান ঘর করতে হয়, যাকে বলে দানঘর। আসল পূজার জন্য জায়গা করতে হয় এর থেকে কিছুদূরে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত চত্বরে, যেখানে আলাদা একটা পূজা মণ্ডপ তৈরী করা হয়ে থাকে। নির্বাচিত জায়গাটি পরিষ্কার করে আগে থেকেই মাটি আর গোবর দিয়ে উত্তমরূপে নিকিয়ে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে রাখা হয়। তারপর সেখানে জার্কার বেড়া দিয়ে ঘিরে পূজা মণ্ডপ তৈরী করা হয়ে থাকে, যার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারদিকে চারখানা দরজা থাকে। এর কেন্দ্রস্থলে একই ধাঁচের আরেকটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রবৃত্ত তৈরী করে উভয় বেড়ার মাঝের ফাঁকা অংশটাকে চারভাগে ভাগ করা হয়। কেন্দ্রস্থলের বৃত্তটি ফাঁকাই থাকে। সমস্ত ব্যাপারটা চতুষ্কোণ কিংবা গোলাকার বৃত্তও করা যেতে পারে। পশ্চিম দরজার মুখে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হয়ে থাকে।

এই পূজায় একাধিক রুরির উপস্থিতি প্রয়োজন এবং এঁদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনিই এই পূজায় পৌরহিত্য করেন। তাকে বলা হয় 'গাথ্যা রুরি'। পূজার সময় তাঁকে 'আঘরতারা' থেকে গাথা পাঠ করতে হয়, এজন্যই সম্ভবতঃ তাঁকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। দানঘরে পাঠ

করতে হয় 'মালেম তারা' আর পূজা মণ্ডপে পাঠ করতে হয় সাহসফুলু তারা' এবং 'ধা-পারামী তারা' (দান পারমী ?)। রান্নাবান্না হয়ে গেলে সমস্ত অন্নব্যঞ্জন প্রথমে দানঘরেই তোলা হয়। সেখান থেকে পরিমাণ মত নিয়ে পূর্বাহ্নের মধ্যেই পূজা মণ্ডপে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। প্রথমে কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহদাকারের অন্নকূট স্থাপন করে পূজা সাজানো হয়। বহির্ভাগের চার অংশে অন্নকূট স্থাপন করতে হয় প্রতি অংশে ষোলটা করে। তবে এগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের হয়ে থাকে। এগুলো দেখতে অনেকটা বৌদ্ধ চৈত্যের মত, মগ ভাষায় যাকে 'জাদি' বলে। এ জন্যই বোধ হয় এই পূজাকে জাদি পূজাও বলা হয়ে থাকে।

এ পূজার একটি অদ্ভুত সত্য আছে। পূজাতে একটি মাকড়সা আসবেই, না এলে পূজা সিদ্ধ হবে না। সেটি যদি আবার পূর্বদ্বারে ঢুকে পূজার যে কোন স্থানে জাল বুনে পশ্চিমদ্বারে বেরিয়ে যায় কিংবা রয়েই গেল 'ভিতরে' তবে গৃহস্থের পক্ষে অতি শুভ ফলদায়ক হয় বলে মনে করা হয়ে থাকে। মাকড়সা আসার আগে পূজায় মাছি বসলে সেটা অশুভ লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়। পরে শত মাছি বসতে পারে, তাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটেনা। কোন কারণে পূজায় যদি মাকড়সার আবির্ভাব না ঘটে তবে গৃহস্থ পরিজন সহ রুরি লুথাক* সকলে মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে পূজা মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করতে হয়, যতক্ষণ না মাকড়সার আগমন ঘটে। তবে সাধারণতঃ এতদুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়না। স্বাভাবিক ভাবেই পূজারম্ভ-কালে মাকড়সার আবির্ভাব ঘটে। এই রকম কোন পূজায় কখনও কোন মাকড়সা আসেনি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটেনি।

পূজা শেষে রুরি লুথাক সকলে এসে দানঘরে আসন গ্রহণ করেন। তখন অবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন ভাগ করে কিছুটা নিজেদের জন্য রেখে বাকীটা দশের খাওয়ার জন্যে মাটিতে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর তখন থেকে মদ, জগরা এবং খানাপিনা চলতে থাকে।

* রুরির সাহায্যকারী।

থান্‌মানা

সম্বৎসরে একবার প্রতি চাকমা পাড়ায় থান্‌মানা পূজা করা হয়ে থাকে। এ'টি একটি সমষ্টিগত পূজা। পাড়ার প্রত্যেক গৃহস্থই এতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। তবে বিশেষ কারণে কাউকে সমাজে একঘরে করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এই পূজায় অংশ গ্রহণ করার অধিকার থাকেনা। অনেকে একে গঙা পূজা বা গাঙ্‌পূজাও বলে। এই পূজার উদ্দেশ্য বহুবিধ যেমন,—পাড়ার ধনৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি, রোগ মহামারী ইত্যাদি থেকে পরিত্রাণ, অজন্মার সময় সুবৃষ্টি কামনা—ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পূজা ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত আছে যদিও পূজা পদ্ধতিতে কিছুটা বিভিন্নতা রয়েছে।

চাষের ধান গোলায় উঠলে সুদিনে সুক্ষণে পাড়ায় পাড়ায় এই সম্মিলিত পূজা অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এ পূজায় একসঙ্গে চৌদ্দজন দেবদেবীর পূজা করা হয়। তাদের মধ্যে প্রধানা হলেন পূর্বে বর্ণিতা গঙাদেবী। তারপরে আছেন বিয়াত্রা, যিনি গঙার স্বামী, ভুত, যিনি একাধারে গঙার ছেলে এবং সেনাপতি, আহ্‌ত্যা, মোত্যা, বড়শিল্‌, মগনী আর সাতবোন কুঙরী বা কুঙারী। যথা :—ব-ত্‌ কুঙারী (শীতলা দেবী), জুরো কুঙারী (ওলা দেবী), শিব কুঙারী, বিনি কুঙারী, ওলু কুঙারী, ফুল কুঙারী এবং ক কুঙারী। এঁরা বিবিধ রোগ ব্যাধির জন্য দায়ী। একই ভূমিকা নিয়ে এই সাতবোন কুমারী পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেও পূজিত হয়ে থাকেন।

পাড়ার লোকের সামর্থ্য বিবেচনা করে প্রথমে পূজার জন্য একটা বাজেট তৈয়ার করে নিতে হয়। ঐ হিসেবে প্রত্যেকের বাড়ী থেকে চাঁদা উঠিয়ে পূজার জন্য শূকর পাঁঠা ইত্যাদি যাবতীয় পূজার উপকরণ কেনা হয়ে থাকে। অবস্থা বিবেচনা করে অনেক সময় এই পূজায় গঙার নামে মোষও

বলি দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট দিন সকালবেলা পূজোপকরণগুলো নিয়ে পাড়ার লোক ঘাটে এসে জড় হয়। ঐখানে জলের কিনারায় পূজার জন্য প্রায় কোমর সমান উঁচু একখানা বাঁশের মাচান তৈরী করে তার উপর মাটি দিয়ে পূজার বেদী তৈয়ার হয়। বেতের ধ্বজা আর নানা রকমের বেতের কারু-কাজ দিয়ে এটাকে তখন সাজানো হয়ে থাকে। এরপর অঝা মন্ত্রপাঠ করে 'আগ্ পাত্তা' ফেলে এক এক দেবতা এবং দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দিতে শুরু করে। গঙা আর আহুত্যা ও মোত্যার জন্য পাঁঠা, ভুতের জন্য শূকর বড়্-শীলের জন্য কবুতর, মগনীর জন্য হাঁস (অভাবে মুরগী) এবং বাকীদের সবার জন্য এক একটা মোরগ বলি দিতে হয়। গঙার জন্য মোষ বলি দেওয়া হলে মোত্যাও তাতে অংশ পায়। গঙা শূকর বলি গ্রহণ করেন না, ভুতের আবার পাঁঠা চলেনা,—এমনি বাছবিচার রয়েছে এদের মধ্যে। কথিত আছে, বিয়াত্রার নিষেধ আছে বলেই গঙা শূকর বলি গ্রহণ করেন না, কিন্তু খাওয়ার বিষম লোভ আছে। তাই অনেক সময় মরণাপন্ন রোগীর রোগ-মুক্তির জন্য শূকরের গায়ে পিটুলি মাখিয়ে গভীর রাত্রে সকলের অগোচরে এবং সম্ভবতঃ বিয়াত্রারও অগোচরে সাদা শূকর গঙার নামে বলি দেওয়া হয়। এভাবে স্বামী ভাঁড়িয়ে শূকর খেয়ে গঙা নাকি খুবই প্রীতহয়ে থাকেন। তাই অনেক সময় রোগী নাকি ধীরে ধীরে নিরাময় হয়ে উঠে।

পূজা শেষে সাধারণতঃ গ্রামের প্রান্তে কোন ছায়া বহুল বড় গাছের নীচে বলি দেওয়া পশুপাখীর মাংস রান্না করা হয়। এখানে কিন্তু ভাত রান্না করা হয়না। এটাও এই পূজার বিশেষত্ব। মাংস রান্না হয়ে গেলে পাড়ার ছেলে বুড়ো সবাই যে যার বাড়ী থেকে ভাত এনে এখানে সরকারী ভোজে শরিক হয়। ভোজের সময় মদ অপরিহার্য আর সেটা প্রায় প্রত্যেক বাড়ী থেকেই প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

এই সমষ্টিগত পূজা আর সম্মিলিত ভোজের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের মধ্যে একতা, সহযোগিতা আর ভ্রাতৃত্ব সুলভ মনোভাব বৃদ্ধি পায়। এটা

যেন পূজার ভিতর দিয়ে গ্রামের সকলের আনন্দের জন্য একটা পিকনিকের বিধান দেওয়া হয়েছে। এতে আর কিছু না হোক সম্বৎসারে অন্ততঃ এক-বার সমস্ত গ্রামবাসী একত্রে মিলে সব কাজ, সব চিন্তা ভাবনা একপাশে ফেলে রেখে সারাদিন প্রচুর আনন্দ উল্লাস আর হৈ হল্লার মধ্য দিয়ে অবকাশ যাপনের সুযোগ পায়।

মালেইয়া

মালেইয়া ঠিক কোন পূজা পার্বণ নয়। এ'টি চাকমাদের একটি প্রাচীন সামাজিক রীতি, এখন প্রায় লোপ পেতে চলেছে। এতে কোন দেবতার পূজা হয়না। কোন গৃহস্থ যদি কোন কাজে পিছিয়ে থাকে, ইচ্ছে করলে সে পাড়ার লোকের সাহায্য নিতে পারে। হয়তঃ কোন কারণে কারও জুম কাটা দেরী পড়ে গেছে ; ঠিক সময়ে জঙ্গল কাটা না হলে কাটা জঙ্গল শুকাবেনা, ভালো পোড়া যাবেনা, ফলে ভাল ফসলও হবেনা। তখন পাড়া পড়শীর সাহায্য নিয়ে সে কাজে সমতা আনতে পারে। সেক্ষেত্রে সে পাড়ার ঘরে ঘরে গিয়ে সাহায্যে আবেদন জানিয়ে আসে। তার পরদিন প্রতি বাড়ী থেকে দা' কুড়াল নিয়ে এক একজন লোক এসে তার কাজটা একদিনেই সম্পন্ন করে দিয়ে যায়। এদের কোন মজুরী দিতে হয়না, শুধু খানাটা দিলে চলে। তা' অবশ্য একটু ভালোই দেওয়ার রেওয়াজ আছে। তখন এ উপলক্ষে সে বাড়ীতে ছোটখাট একটা ভোজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। গৃহস্থের অসচ্ছলতা থাকলে কিন্তু অনেক সময় এমনিই সবাই কাজ করে দিয়ে আসে। জুমে নিড়ানি দেওয়ার বেলায় কিংবা ফসল কাটার সময়ও মালেইয়া ডাকা যায়। নিঃসন্দেহে এ'টি একটি খুব ভালো প্রথা। এতে পারস্পরিক সহানুভূতি আর সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়, সামাজিক বাঁধন সুদৃঢ় থাকে। এক কথায় এই প্রথা

প্রাচীন চাকমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় বহন করে। এমন সহজ ভ্রাতৃত্ববোধ একমাত্র উপজাতীয়দের মধ্যে ছাড়া বোধহয় সভ্য জগতে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

এই প্রসঙ্গে পুরোনো দিনের মিজোদের একটা ব্যাপার এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে মিজোদের মধ্যে কারো কোন অপরাধে জেলের হুকুম হলে তখন তার যতদিনের জেলের মেয়াদ তার ততজন আত্মীয় এসে জেলে কাজ করে দিয়ে দিনে দিনে তাকে খালাস করে নিয়ে যেত। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও তাদের সরলতা দেখে তাই মেনে নিতেন। এটাও তাদের এক ধরণের ম'লেইয়াই বলা চলে।

আহ্ল্ পালানী

প্রত্যেক বৎসর ৭ই আষাঢ় অম্বুবাচী প্রবৃত্তি থেকে তিন দিন চাকমারা হালচাষ বন্ধ রাখে। হিন্দুমতে এই সময় বসুমতী ঋতুমতী হয় আর তার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে শস্যধারণ ক্ষমতা জন্মে। এই কয়দিন হালকর্ষণ কিংবা কোন প্রকার মাটি খোঁড়াখোঁড়ি নিষিদ্ধ। এই সময় চাকমারা অন্য কোন কাজকর্ম কিংবা মজুরীও করেনা। সবাই বাড়ী বাড়ী ঘুরে মদ খায় আর আমোদ ফুর্তি করে অবসর যাপন করে। এই সৎসবকে বলে 'আহ্ল্ পালানী'। অর্থনৈতিক কারণে তিনদিন কাজমর্ম বন্ধ রাখা এখন অবশ্য সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই কেউ কেউ হয়তঃ একদিন মাত্র এই উৎসব পালন করে থাকে।

মাথাধুয়া

মাথাধুয়া অর্থ মাথাধুয়ে ফেলা, গূঢ় অর্থে পরিশুদ্ধ হওয়া। যখনই কোন চাকমা গৃহস্থ মনে করে যে কোন কারণে তার 'ফী বলা' অর্থাৎ

বালা মুছিবত বা আপদ বালাই উৎপন্ন হয়েছে, তখন এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় গৃহ পরিজন সহ পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমষ্টিগত ভাবে একই গোষ্ঠীভুক্ত তাবৎ লোকজন সবাইকে এভাবে পরিশুদ্ধ হ'তে হয়। এ অনুষ্ঠানকে 'বুর্‌ পারা' অনুষ্ঠানও বলা হয়ে থাকে। চাকমা অঝা বৈদ্যদের মতে বারো রকমের ফী বলা রয়েছে। যথা :—

১। **চাং ফী** :—মগ ভাষায় চাং অর্থে হাতী। কারো ঘর হাতীতে ভেঙ্গে দিলে গৃহস্থের এই ফী বলা উপস্থিত হয়।

২। **মাং ফী** :—মগ ভাষায় মাং অর্থে রাজা। কোন সাধারণ প্রজার ঘরে দৈবাৎ রাজার পদার্পণ ঘটলে সেই প্রজার ঘরে এই ফী বলা উপস্থিত হয়। এক্ষেত্রে রাজাকে তখন সেই প্রজার আপদ বালাই কাটানোর জন্যে তাকে খীসা কিংবা কার্বারী পদ দিয়ে সমাজে উন্নীত করতে হয়। অন্যথায় সামাজিক বিধিমতে এই ফী বলা দুর করার জন্যে আনুষ্ঠানিক যাবতীয় ব্যয়ভার রাজাকেই বহন করতে হয়।

এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, উপরোক্ত 'চাং' এবং 'মাং' এই মগী শব্দ দু'টির কিভাবে এখানে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তার কোন হদিস পাওয়া যায়না। শুধু এই পূজা ছাড়া চাকমা ভাষায় আর কোথাও এই শব্দ দু'টি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়না।

৩। *চিল ফী* :—কোন গৃহস্থের ঘরের চালে যদি চিল শকুন বসে, তার এই ফী বলা উপস্থিত হয়। এই যদি ব্যাপার প্রথমে বাইরের কোন লোকের চোখ পড়ে তবে তার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে, ঐ বাড়ীতে গিয়ে ঘরের খুঁটি কিংবা বেড়া যা'হোক কিছু একটা ছুঁয়ে তদ্দণ্ডেই বাড়ীর মালিককে এ বিষয়ে অবহিত করা। অন্যথায় এই ফী বলা তার গায়েই লাগে।

৪। *শিগিরা ফী* :—অনুরূপ ভাবে কোন গৃহস্থের ঘরের চালে বাজপাখী বসলে উপরোক্ত একই বিধান প্রযোজ্য।

৫। পেজা ফী ঃ—কারো ঘরে যদি হঠাৎ পেঁচা ঢুকে পড়ে তখন সেই ঘরে এই ফী বলা উপস্থিত হয়।

৬। উই ফী ঃ—কারো ঘরে কালো উইপোকা উঠলে সেই ঘরে এই ফী বলা উপস্থিত হয়।

৭। গুই ফী :—কোথাও যাওয়ার সময় কেউ যদি হাত পা উপরমুখো করে অস্বাভাবিক ভাবে স্থিত মৃত গোসাপ দর্শন করে তবে সেই ব্যক্তির এই ফী বলা উপস্থিত হয়।

৮। বিয়া ফী ঃ—বিয়ে করলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের এই ফী বলা উৎপন্ন হয়। নব বিবাহিত বধূকে এই ফী বলা দূরীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গোত্রান্তরিত করা হয়। তৎপূর্বে বর কিংবা বধু উভয়ের কারো বাড়ীতে প্রবেশ করা নিষেধ।

৯। বিয়ালা ফী :—সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির এই ফী বলা উৎপন্ন হয়।

১০। মাতৃদশা ঃ—মাতার মৃত্যুতে এই ফী বলা উৎপন্ন হয়।

১১। পিতৃদশা :—পিতার মৃত্যুতে এই ফী বলা উৎপন্ন হয়।

১২। গুরুদশা :—গুরুর মৃত্যুতে এই ফী বলা উৎপন্ন হয়।

এই বারো রকমের ফী বলা ছাড়া আরো অনেক প্রকার দৈব দুর্বিপাকেও গৃহস্থের অকল্যাণ সূচিত হয় বলে চাকমাদের বিশ্বাস। সেক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়ায় গৃহস্থকে পরিশুদ্ধ হতে হয়। যেমন,—বাড়ীস্থ কেউ মারা গেলে, ঘরে আগুন লাগা কিংবা বজ্রপাত হলে, কারো মুরগীতে যদি নরম ডিম দেয় ইত্যাদি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঘরে ফী বলা লাগে। কারো কলার ছড়া যদি আপনা আপনি গাছ থেকে ছিঁড়ে পড়ে কিংবা অস্বাভাবিক ভাবে গাছের কাণ্ড চিরে থোড় মোচা বার হয় অথবা একটা ছড়া বার হবার পর

কিছুদূর ব্যবধানে একই বোঁটায় দ্বিতীয় ছড়া অ'সে, কারো ঘরের চালে যদি দৈবাৎ কুকুর উঠে, তাতে গৃহস্থের পরম অকল্যাণ সূচনা করে। এই সমস্ত ব্যাপার যদি প্রথমে বাইরের কোন লোকের চোখে পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ তাকে গৃহস্থের কাছে গিয়ে জানাতে হয়। অন্যথায় তারও একই ফী বলা উৎপন্ন হয়। উড়ন্ত মৌমাছি যদি কাউকে কামড়ে দেয় তবে ঐ লোকটার সমূহ বিপদ বলে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে। আর কাউকে কুমীর কিংবা বাঘে নিয়ে গেলে তার গোষ্ঠীভুক্ত লোকজন সবাইকে পরিশুদ্ধ হতে হবে। তখন কিন্তু সকলে সমবেতভাবে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়।

পূর্বোক্ত কোন কারণে ফী বলা উৎপন্ন হলে গৃহস্থের পক্ষে মাধাধুয়া বা বুর্ পায়া প্রক্রিয়ায় পরিশুদ্ধ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় গৃহের যে কোন সদস্যের অপমৃত্যু, ধনহানি, রোগভোগ ইত্যাদি বিবিধ অমঙ্গল ঘটতে পারে। মাধাধুয়া অনুষ্ঠান অঝার পৌরহিত্যেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই পূজার উপকরণ হলো (১) ঘিলা (২) কজই (৩) ইঝিং, সোনা (অভাবে কাঁচা হলুদ), রূপা, দুটি মোরগ একটি মুরগী বা মুরগীর বাচ্চা ইত্যাদি। সাধারণতঃ দিনের বেলা এই পূজা করা হয়ে থাকে। অঝা প্রথমে সবাইকে ঘরের বাহির করে দেয়। পূজার সময় ঘরে আগুন রাখা নিষেধ, তাই খড়ের বেণীতে করে ঘরের আগুন বাইরে এনে চুলোর আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। বেণীর আগুন নিভে গেলে কিন্তু মুস্কিল। পূজা শেষে তখন অন্যের কাছ থেকে আগুন কিনে আনতে হয়। এরপর অঝা ঘরে দোরে মন্ত্রপুত পানি ছিটিয়ে, দরজা জানালা বন্ধ করে, মাচান ঘর হলে সিঁড়ি উপুর করে বাড়ীর বার হয়ে আসে এবং পূজার উপকরণাদি সহ সবাইকে নিয়ে ঘাটে যায়। এই সময় চোরে যাতে কোন কিছু চুরি করতে না পারে কিংবা কেউ বাড়ীতে ঢুকতে না পারে সেজন্যে একজন বিশ্বাসী আত্মীয় বাইরে থেকে ঘর পাহারা দিতে থাকে।

ঘাটে গিয়ে অঝা পানিতেই চারটি বাঁশের খুঁটি পুটে তার উপর ছোট একখানা মাচান তৈরী করে তাতে মাটি দিয়ে একটা ঢিবি বানায়। ঢিবির

উপরে বিরতখানেক লম্বা কয়েকখানা মাথায় ফুল কাটা বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দেওয়া হয়। এগুলো দেখতে অনেকটা মোরগের ঝুটির মত। এগুলোকে বলে, 'মারেই'। মোটামুটি এই হল পূজার বেদী। অঝা তারপর আগ্-পাতা ফেলে একটি একটি করে মোরগগুলো বলি দিয়ে সেগুলোর রক্ত আর নাড়িভুঁড়ি পূজা বেদীতে মদ্য পানীয় সহযোগে দেবতার নামে নিবেদন করে। এই পূজায় তিনজন দেবদেবীর পূজা করা হয়ে থাকে। যথা :—গঙা, গঙার স্বামী বিয়াত্রা আর ভূত, যে একাধারে গঙার ছেলে এবং সেনাপতি। এই তিনটি দেবদেবীর পূজার পর অঝা একটি বাঁশের চোঙায় ঘিলা, কজই, ইঝিং, সোনারূপা ইত্যাদি উপকরণ পুরে নিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে স্রোতের নিম্নমুখী হয়ে চোঙাতে জল ভর্তি করে। তারপর ঐ মন্ত্রপুত জল দিয়ে বয়সানুক্রমে প্রথমে বাড়ীর প্রত্যেক পুরুষ সদস্যের নাম ধরে ডেকে সাতবার 'শুদ্ধ! শুদ্ধ!' ইত্যাদি মন্ত্র পড়ে তার ডানদিকের জুলফির চুল ধুইয়ে দেয়। এরপর অনুরূপ ভাবে মেয়েদের বাম জুলফি ধোয়া হয়। কোন পানি কিন্তু এ সময় মাটিতে পড়তে দেওয়া হয়না। অঝা সব সময় একটা নতুন হাঁড়িতে ঐ সব জল ধরে রাখে (তার) আর পরে হাঁড়িশুদ্ধ জলে ভাসিয়ে দেয়। সবাইকে পরিশুদ্ধ করার পর অঝা অবশিষ্ট মন্ত্রপুত জলসহ তাদের নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। প্রথমে অঝা ঘরে ঢুকে আগের মত ঘরে দোরে মন্ত্রপুত জল ছিটিয়ে দ্বিতীয়বার ঘর পরিশুদ্ধ করে। এরপর সবাই ঘরে প্রবেশ করতে পারে। তখন বলি দেওয়া মুরগীর মাংস রান্নাবান্না করে ধুমসে খানাপিনা চলে।

বিয়ালা কী অর্থাৎ প্রসূতির ব্যাপারে কিন্তু পুরোপুরি এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয় না। নব জাতকের নাভি ঝরে গেলে যে কোনদিন, যে ধাই ছেলে খালাস করে, সে এসে ঘিলা, কজই আর সোনারূপার পানি দিয়ে প্রসূতিকে শুদ্ধ করে দিলেই সে পাকস্পর্শ করতে পারে। এ অনুষ্ঠানের নাম 'কজই পানি লনাহ্'। আগেকার দিনে স্ত্রী অঝাকে এ বাবদ ১ কুরুম

চাল, ১ বোতল মদ, ১টি মোরগ আর একখানা খাদি পারিতোষিক দেওয়ার নিয়ম ছিল।

---

(১) এক প্রকার বুনো লতার ফল। এগুলি চাকমা ছেলেমেয়েদের প্রিয় খেলার উপকরণ। আসল ফলটা কিন্তু হাত দুয়েক লম্বা। এর অনেক-গুলো খোপ এবং প্রত্যেকটা খোপে এক একটা ঘিলা থাকে। এই লতার ফুল দেখা যায় না। হঠাৎই একদিন ফল দেয়। চাকমাদের বিশ্বাস, ঘিলা লতায় ছাতা প্রমাণ অপূর্ব সুন্দর ফুল হয়। কিন্তু দেবংশী বলে মনুষ্য চোখে তা দেখা যায়না। যে লোক দৈবাৎ দেখতে পায় সে নাকি রাজা কিংবা তৎসমতুল্য কেউ কেটা হয়ে যায়।

(২) এক প্রকার গুল্ম জাতীয় কাঁটা গাছের ফল, দেখতে অনেকটা তেঁতুলের মত।

(৩) দুর্বা জাতীয় ঘাস।

জুম মারানা

চাকমারা জুম করে। কিন্তু যেখানে সেখানে নয়। কতকগুলো নিষিদ্ধ জায়গা আছে। যেখানে জুম করা যায়না। যথা :— ন টানা, থম্বক্‌গাত্‌, বাদোল থাত্‌, ডো ধুলোন্‌, আহ্‌জা, বিয়াত্রা ভিদা ইত্যাদি। এইসব নিষিদ্ধ এলাকায় জুম করার একমাত্র পরিণতি হল মৃত্যু। হয়তঃ বাড়ীর সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নতুবা পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের অবধারিত মৃত্যু হতে পারে। কোন জায়গায় জুম করার সময় এভাবে বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠ অথবা সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের দৈবাৎ মৃত্যু ঘটলে সেই জুমের জায়গা ভবিষ্যতের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ জেলায় এমনি বহু জায়গা রয়েছে,

যেখানে কেউ জুম করতে সাহস করেনা। এই নিষিদ্ধ জায়গাগুলোর শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'জুম মারানা'। এ কাজের জন্যে বিশেষ অঝা আছে। সাধারণ অঝারা এ কাজে দক্ষ নয়।

উপরোক্ত জায়গাগুলো কি কারণে জুমের জন্য দোষাবহ হয়ে গেল তার পেছনে একটা কাহিনী আছে। কথিত আছে, কোন এক রাজার দুই ছেলে আর দুই মেয়ে ছিল। রাজার মৃত্যুর পর রাজ্য নিয়ে দু'ভায়ের মধ্যে যখন মরণপণ সংগ্রাম চলছে এমনি সময়ে তাদের নিরস্ত করার জন্য রাজকন্যা দু'ভাইয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় আর সাথে সাথে যুদ্ধোন্মত্ত দু'ভাইয়েরই অস্ত্রাঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার পতনে দুই ভাইয়ের চৈতন্যোদয় হল। তখন দুই ভাই তাকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করতে থাকে। সে ছিল আবার বিষকন্যা*। যেহেতু তার সর্বাঙ্গে বিষ—তার মৃত্যুতে তার দেহের বিষ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। মৃত্যুর সময় রাজকন্যা তার এই বিষ থেকে রক্ষা পেতে হলে সেই সব বিষাক্ত জায়গা কি ভাবে শুদ্ধ করে নিতে হবে তার একটা বিধান দিয়ে যায়।

---

* প্রাচীন ভারতে এক রাজার অপর শত্রুরাজাকে কৌশলে ঘায়েল করার জন্য কোন সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ে সংগ্রহ করে তাকে শিশুকাল থেকে খাদ্যের সঙ্গে অল্প অল্প করে বিষ খাইয়ে মানুষ করে তুলতেন। বয়সের সাথে বিষের মাত্রাও বাড়িয়ে দেওয়া হত। এমনি করে করে বয়:প্রাপ্ত হলে সে যেকোন পরিমাণ বিষ হজম করার শক্তি লাভ করত। কারণ তখন তার সর্বাঙ্গে বিষ, প্রতি নিশ্বাসে বিষ। এদিকে তাকে আবার নাচে গানে বিবিধ শিল্পকলার পারদর্শিনী করে একজন মোহময়ী স্বর্গের অপ্সরী করে গড়ে তোলা হত। কোন শত্রু রাজাকে ধ্বংশ করতে হলে কৌশলে তার সাথে বিষকন্যার মিলন ঘটিয়ে দিলেই হলো; উভয়ের দৈহিক মিলনে রাজার মৃত্যু ছিল অবধারিত।

কাহিনীটা অনেকটা বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ খণ্ডিত হওয়ার ঘটনার মত। রাজকন্যার মৃত্যুর পর তার পিঠ যেখানে গিয়ে পড়ে সেখানে সৃষ্টি হল 'ন টানা'। 'ন' মানে হল নৌকা। পাহাড়ের কোন অংশে কোন জায়গা যদি লম্বালম্বি হঠাৎ ঈষৎ বসে যায় আর তা' দেখতে যেন কেউ তার উপর দিয়ে একটা নৌকা টেনে নিয়ে গেছে এরূপ দেখায়, তখন সেটাকে বলা 'ন টানা'। দেখতে অনেকটা মানুষ শিরদাঁড়ার নীচু অংশটার মত।

চোখ দু'টি যেখানে সেখানে পড়ে সেখানে সৃষ্টি হল 'থম্বক্‌গাত্‌'। কোন প্রকাণ্ড গর্ত যখন খাড়া ভাবে সোজাসুজি মাটির গভীরে চলে যায় তখন তাকে বলা হয় 'থম্বক্‌গাত্‌'। বৃহৎ উল্কা পতনেও এরূপ গর্তের সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্যে অনেকে এরূপ 'তারাপোজ্যা গাত্‌' বলে।

রাজকন্যার নাক যেখানে পড়ে সেখানে সৃষ্টি হল 'বাদোল্‌ খাত্‌'। অর্থাৎ কিনা বাদুড়ের গুহা। পাহাড়ের গাঁয়ে স্থানে স্থানে এরূপ বহু গুহা দেখা যায়, সেগুলো সুড়ঙ্গের আকারে বহুদুর চলে গেছে। এইসব অন্ধকার গুহায় সাধারণতঃ বাদুড়, চামচিকা ইত্যাদি আঁধারের প্রাণীরা দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে। পাহাড়ের গায়ে এসব গুহা সবসময় ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে থাকে বলে গরমের সময় এগুলোর ভিতর থেকে বহির্মুখী মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস বয়। চাকমারা এই বাতাসকে বলে 'গাতের নিশ্বাস'। এই বাতাস বাস্তবিকই দূষিত এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী।

কানগুলো যেখানে যেখানে পড়ে সেখানে সৃষ্টি হল 'ভ্যো ধুলোন্‌' অর্থাৎ দৈত্যের দোলনা। কোন প্রকাণ্ড লতা যখন ছড়ার এপাড়ের গাছ থেকে সোজা ওপারের কোন গাছে গিয়ে বেয়ে উঠে তখন তাকে বলা হয় 'ভ্যো ধুলোন্‌'।

সব শেষে স্ত্রী অঙ্গ যেখানে গিয়ে পড়ে সেখানে সৃষ্টি হয় 'আহ্‌জা' (Salt petre) এ জেলায় যেখানে সেখানে 'আহ্‌জা' দেখা যায়। ঐগুলোতে

হাতী থেকে শুরু করে নানা জাতের পশুপাখী নোনা খেতে আসে। এসব জায়গায় জুম করলে কিংবা কিছু শিকার করে রক্তপাত ঘটালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কুষ্ঠরোগ হয় বলে চাকমাদের বিশ্বাস।

চারধারে সমতল জমি, মাঝখানে হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে একটু উঁচু ভিটে তাকে বলা হয় 'বিয়াত্রা ভিধা' অর্থাৎ বিয়াত্রা দেবতার ভিটে। আগেই বলা হয়েছে ইনি হলেন গঙা দেবীর স্বামী এবং তাবৎ ভূত প্রেতের জনক। তার ভিটেতে জুম করতে যাওয়া আস্পর্দ্ধার বিষয়ই বটে।

যত রকমের জুমের দোষ আছে, গর্তগুলো তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। এগুলোর দোষ অনেক সময় কাটান যায়না। তাই পারতপক্ষে এগুলো বাদ দিয়েই জুম করা হয়। এগুলোর দোষ কাটান দিতে হলে শূকর, মোরগ ইত্যাদি বলি দিতে হয়। অঝা বিধিমতে আগ্‌পাতা ফেলে গর্তের মুখে বলি দেয় এবং মন্ত্র পড়ে গুহাবাসী দেবতাকে আহ্বান করে। এসময় গর্ত থেকে সাপ, ব্যাঙ, শতপদী, বৃশ্চিক, মাকড়সা, কাঁকড়া ইত্যাদি যা কিছুই বেরিয়ে আসুক তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলতে হবে। তা' যদি সম্ভব না হয় তবে অঝা আর গৃহস্থের ভবিষ্যত সঙ্কটাপন্ন হয়, এমনকি তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ধরে নেওয়া যায়।

বাকী দোষগুলো নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ায় কাটান দেওয়া যেতে পারে উপকরণ,—পাঁচ রকমের শাকপাতা, একটি সুঁচালো বাঁশ, তীর ধনুক, একখানা কোদাল ইত্যাদি। অঝা বিধিমতে 'আগ্‌পাতা' ফেলে শাকপাতাগুলো দিয়ে পূজা করে, তারপর দেবতার উদ্দেশ্যে বলতে থাকে,—'তোমার ভোগ তোমাকে দিলাম। তুমি এই জুমের মালিকের অনিষ্ট করবেনা। যদি কর, তবে আকাশেও যদি যাও এই তীর ধনুক নিয়ে তোমাকে মারবো। পাতালে যদি যাও এই কোদাল দিয়ে খুঁড়ে বার করবো। আর গাছের আগায় উঠলেও তোমার নিস্তার নেই,—সুঁচালো বাঁশ দিয়ে তোমার এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলবো। তুমি এখনই আমার হুকুমে এখান থেকে চলে যাও।

কেমন, যাবেতো ? তারপর নিজের মুখেই 'যাচ্ছি যাচ্ছি,—' বলে অঙ্গভঙ্গি সহকারে দেখায় যেন সত্যি সত্যি কেউ চলে যাচ্ছে।

পূর্বোক্ত দোষগুলো ছাড়া জুমের জন্য জঙ্গল কাটার সময় সেখানে যদি মরা বাঁদরের মরা বাঁদরের মাথার খুলি কিংবা মরা পাখী পাওয়া যায় তবে সেই জুম ছেড়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, বাড়ীর কেউ না কেউ পাগল হয়ে যাবে। জুম কাটার সময় ভূমিকম্প হলে সে জুমও পরিত্যাগ করা হয়। নতুন বাড়ী করার সময় ভূমিকম্প হলেও তা ভেঙ্গে আবার নতুন করে কাজ শুরু করা হয়ে থাকে। জঙ্গল কাটার সময়ে জুমে দা' শান্ দেওয়ার পাথর যদি শান্ দিতে দু টুক্‌রো হয়ে যায় তবে সে জুমও অবশ্য পরিত্যাজ্য। এ সমস্ত দোষ দূর করার জন্য কিন্তু কোন বিধি বিধান নেই।

কুলুক্ মারানা

অনেক সময় দেখা যায় কারো কারো গায়ে দাদ, খাজুলি, একজিমা ইত্যাদি চর্মরোগ বছরের পর বছর লেগেই আছে। শত ঔষধ প্রয়োগ, হাজারো চিকিসাতেও এসব রোগ কিছুতেই যেন আর ভালো হতে চায়না। চাকমারা রোগের এঅবস্থাতে বলে,—'কুলুগত্ লাগানা'। 'কুলুক' অর্থ দুষিত স্থান যেমন, আহুজ্ঝা, পচা নর্দ্দমা, পচা ডোবা, বদ্ধ জলাভূমি ইত্যাদি। এসব জায়গা স্বভাবতঃই দুষিত এবং বিবিধ রোগ জীবাণুর প্রজনন কেন্দ্র। চাকমা বিশ্বাসমতে রোগগ্রস্ত ব্যক্তি হয়তঃ কোন এক সময় এরূপ কোন দুষিত স্থানে পা দিয়েছিল আর সেখান থেকেই তার গায়ে এই রোগ সংক্রামিত হয়ে পড়ে। চাকমা অঝা বৈদ্যরা তখন বিশেষ পূজা পদ্ধতির মাধ্যমে এসব রোগ নিরাময় করে থাকে। এই বিশেষ প্রক্রিয়ার নাম 'কুলুক্ মারানা'। অনেকে একে 'খাং বানানাহ্'ও বলে। কারো গায়ে যদি এরূপ কোন রোগ দেখা দেয়, তবে প্রথমে রোগের উৎপত্তিস্থল

নির্ণয় করতে হয়। বিবিধ উপায়ে এটা করা হয়ে থাকে। কোন কোন অঝা খড়ি (কড়ি) চালান দিয়ে, কেউ নখ দর্পণ প্রক্রিয়ায়, কেউবা গোণা-গাথা করে নির্দ্দিষ্ট জায়গা খুঁজে বার করে। রোগীকে নিরাময় করতে হলে তখন ঐ জায়গায়, তা সে যত নোংরা জায়গাই হোক্ -গিয়ে পূজা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

চাকমা অঝা বৈদ্যদের মতে গঙা, খগিনী, মগনী ও নায়েংঙ্যা এই চারিজন দেবতা বা অপদেবতার যে কোন একজনের কারণে উপরোক্ত চর্ম-রোগাদি উৎপন্ন হয় এবং সে কারণে তার সন্তুষ্টি বিধান ছাড়া কোন ঔষধই এই সমস্ত রোগে কার্যকরী হতে পারে না। যখন যে দেবতার কারণে রোগের উৎপত্তি ঘটে তখন সে দেবতার প্রাপ্য পূজা দিয়ে রোগের চিকিৎসা চলে। সেজন্যে তেলপড়া জাতীয় ঔষধপত্রেরও ব্যবস্থা আছে। পূজা দিতে হয় সরাসরি রোগের উৎপত্তিস্থলে। সেখানে সংশ্লিষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে বিধিমতে একটি হাঁস কিংবা মোরগ অথবা মুরগী, যেটা তার প্রাপ্য, বলি দিয়ে সেই দেবতার সন্তুষ্টি বিধান করতে হয়। অনেক সময় শুধু একটা হাঁসের ডিম দিয়েও পূজা দেওয়া হয়ে থাকে। ডিমটা পূজাস্থানেই অঝা মন্ত্র পড়ে পুঁতে দিয়ে আসে। এক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত ডিম খাওয়া রোগীর পক্ষে বারণ থাকে।

ভূত পূজা

খেলার সময় লাটিম হারায় বা ঘিলা হারায়, ছোট ছোট চাকমা ছেলেমেয়েরা সুর করে বলতে থাকে,—'ভুদেই মা! দেখেই দে, দেখেই দে, বিজ্ কুরাবুয়া কাবি দিম।' (ভূতের মা, দেখিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও, বীজের মোরগটা কেটে ভোগ দেব।) সত্যি সত্যি জিনিষটা যখন খুঁজে পাওয়া যায় ছেলেরা তখন আর অবশ্য কিছু করেনা। কিন্তু বড়দের যখন গরু হারায়

কিংবা কোন বাচ্চা ছেলেকে 'কিছুতেই যখন খুঁজে পাওয়া যায়না, তখন ভূতের কাছে মোরগ মানত করে। তারপর যখন কোন অসম্ভব জায়গা থেকে সেই গরু কিংবা হারানো ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যায়, তখন মনে করা হয়, সত্যিই তাকে ভূত লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু মোরগ মানত করাতে ছেড়ে দিয়েছে। তখন অঝা ডেকে ভূতের উদ্দেশ্যে একটা মোরগ বলি দেওয়া হয়। কাউকে ভূতে পেলে তখনও মোরগ বলি দেওয়া হয়ে থাকে ভূতের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে। ভূত ছাড়ানোর জন্যে অবশ্য অঝাদের ঝাড়-ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রও আছে। কোন কোন অসুখ বিসুখের বেলায় চাকমা অঝা বৈদ্যেরা ভূতদের দায়ী করে এবং সেসব রোগের প্রারম্ভিক চিকিৎসা হিসাবে ভূতের জন্য শূকর কিংবা মোরগ বলি দিয়ে থাকে।

ঠিক দুপুর বেলা কারো যদি রোজ গায়ে জ্বর আসে, তখন সেই ব্যক্তি রোগমুক্তির জন্য পাঁচপদ কি সাতরকম শাকপাতা সিদ্ধ করে চৌরাস্তার মাথায় নিয়ে ভূতের উদ্দেশ্যে সেগুলো মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এই বলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসে,—'তোমার পাওনা তোমার সাধের শাকগুলো দিয়ে গেলাম। এবার আমাকে রেহাই দাও।' এর নাম 'খ কেলা'। এতেও নাকি অনেকে ভালো হয়ে যায়।

ভূতের পূজায় বলি দেওয়ারও কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট বিধি বিধান আছে। পালাজ্বর ছাড়ানোর জন্যে বড় শিয়াল্যা নামক ভূতের কাছে বলি দিতে হয়। নদীর ধারে এই বলি দেওয়া বিধি। 'সাঝঅ কুরাহ্' বলি দিতে হয় ভর সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর সিঁড়ির গোড়ায়। পূজার পর এই সব বলির মাংস রান্না করে ভূতের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার ভোগ নিবেদন করতে হয়; তারপর খাওয়া যায়। 'দিবুজ্যা শুগোর' বলি দেওয়ার বিধি চৌরাস্তার মাথায় ঠিক দুপুর বেলা। কোন দুরারোগ্য রোগীর রোগমুক্তি কামনায় যখন এরূপ শূকর বলি দেওয়া হয় তখন বিধিমতে পুজা দেওয়ার পর সেই বলির মাংস রান্না করে একখানা ডালায় সাজিয়ে বাড়ীর উঠানে দ্বিতীয়বার ভূতের উদ্দেশ্যে নিবেদন

করতে হয়। ঐ সঙ্গে ডালাতে খই আর নানাপদের (রকম) শাকসবজিও দেওয়া হয়ে থাকে। বাড়ীর উঠানে এই ডালা সাজিয়ে অঝা প্রদীপ জ্বেলে মন্ত্র পড়ে তাবৎ অশরীরীদের আহ্বান করতে থাকে — 'উত্তরত্থুন্ এঝ, দখিনত্থুন এঝ, পুগত্থুন্ এঝ, পঝিমত্থুন এঝ, (ডালায় কাঠি দিয়ে এক এক আঘাত করে)—এক বারি দিলুং, একধিনঅ পথত্থুন্ এঝ; দি বারি দিলুং, দিধিনঅ পথত্থুন্ এঝ; তিন বারি দিলুং, তিন ধিনঅ পথত্থুন্ এঝ; চের বারি দিলুং, চের্ ধিনঅ পথত্থুন এঝ; পাচ বারি দিলুং, পাচ ধিনঅ পথত্থুন এঝ; ছ বারি দিলুং, ছ ধিনঅ পথত্থুন এঝ; সাত বারি দিলুং, সাতধিনঅ পথত্থুন এঝ। লেংঙোরে আন কানাত্ গুরি, কানোরে আন আহ্দত্ ধুরি, ধুলোনত্ গুরা থেলে সিগুন্ আন ধুলোনত্ গুরি। আগারেত্থুন্ এঝ কাব্যাত্ গুরি, এহ্দেত্থুন্ এঝ নত্ চরি—ইত্যাদি ইত্যাদি।' ভূতদের উদ্দেশ্যে সে এক সার্বজনীন ভোজের দাওয়াত! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারদিকের ভূতেরা এস; একদিন দু'দিন তিনদিন, চারদিন, পাঁচদিন, ছয় দিন, সাতদিনের দূরের রাস্তা থেকে এস। ল্যাংড়াকে আনো কাঁধে করে, কানাকে আনো হাতে ধরে। দোলনার শিশুদের আনো দোলনায় করে। উজানবাসীরা এস ভেলায় চড়ে, ভাটিদেশ থেকে এস নৌকায় চড়ে। যে যেখানে আছ, যে অবস্থায় আছ সবাই চলে এস, কেউ যেন বাদ না যায়। কেউ যদি বাদ পড়ে অঝার দোষ দিওনা। এভাবে নিবেদনের পর ডালাটা কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে পরে বাড়ীতে তুলে পূজার মাংস খাওয়া যায়।

ভূতদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো 'চেলা'। এর প্রকাণ্ড শরীর, কিন্তু মস্তকহীন। দুই বাহুমূলে আগুনের গোলকের মত এর দু'টি চোখ। বর্ণনায় বোধ হয় হিন্দুদের কন্ধকাটা বা কবন্ধ। এর নজর পড়লে আর রক্ষা নাই। তবে অনেক সময় শূকর বলি দিয়ে একে নাকি সন্তুষ্ট করা যায়। সেজন্যে কোন মরণাপন্ন রোগীর শেষ চিকিৎসা হিসাবে চেলার নামে শূকর বলি দিয়ে রোগীর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে অঝা একটি শূকর ছানা, কিছু খই, একটি তৈল

প্রদীপের উপকরণ ইত্যাদি নিয়ে একাকী জঙ্গলে পূজা দিতে যায়। গভীর জঙ্গলে পৌঁছে প্রথমে সে দীর্ঘ প্রলম্বিত স্বরে তিনবার 'কু' দেয়। সেই উৎকট শব্দ নির্জন অরণ্যে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে স্বভাবতই তখন একটা ভৌতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। তারপর কোন এক গাছের গোড়ায় পূজার উপকরণ গুলো সাজিয়ে প্রদীপ জ্বেলে মন্ত্র পড়ে অঝা চেলাকে আহ্বান করে আর আগ্‌পাতা ফেলে শুকর ছানাটি তার উদ্দেশ্যে বলি দেয়। এই সময় নাকি নানারকম অস্বাভাবিক শব্দসাড়া পাওয়া যায়। হয়ত বিনা বাতাসে কোথাও গাছের শাখা ঝোপঝাড় ইত্যাদি প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠে কিংবা মনে হয় কে যেন সারা বন তোলপাড় করে সবকিছু দলে পিষে এগিয়ে আসছে। তখন হয়তঃ বা শোঁ শোঁ শব্দে প্রবল বাতাস বইতে শুরু করল। সেই বাতাসে যদি পূজার প্রদীপটি নিভে না যায় তবে বুঝতে হবে রোগী এ যাত্রায় বেঁচে গেল। আর যদি নিভে যায় তখন আর কোন আশাই থাকেনা। খুব সাহসী না হলে এ পূজায় অঝাগিরি করা চলেনা। অঝা অবশ্য সাধ্যমত মন্ত্রতন্ত্র পড়ে গায়ে রক্ষা কবচ বেঁধে নিয়ে যায়। তবু নাকি সময় সময় অঘটন ঘটে আর পরদিন অঝাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই পূজার মাংস বাড়ীতে তোলা নিষেধ। ভালয় ভালয় পূজা উৎরে গেলে বাড়ীর বাইরে কোথাও এই মাংস রান্না করে খাওয়া চলে। ঐ পূজা [illegible] করে দ্বিতীয়বার ভোগ নিবেদনের প্রয়োজন হয় [illegible]

শিজি

অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন সন্ধ্যার মুখে কচি ছেলে নিয়ে কোথাও বেরোতে গেলে মায়েরা সাধারণতঃ ছেলের কপালে কাজল কিংবা তেলকালি দিয়ে একটা টিপ দিয়ে দেন। চাকমা জননীরাও তাই করে থাকেন। চাকমা বিশ্বাসমতে ছেলের উপর অপদেবতার কুনজর নিবারণের উদ্দেশ্যেই

এটা করা হয়ে থাকে। এ অপদেবতার নাম 'শিজি'। অনেকে একে 'কাল্সুং' ও বলে থাকে। মুখ্যতঃ বাচ্চা ছেলেদের উপরই এর কুনজর বেশী। সাধারণতঃ ভর সন্ধ্যাবেলায় নাকি এর উপদ্রব বাড়ে আর তাই পারতপক্ষে কেউ এ সময়টায় বাচ্চাদের ঘরের বার করেন না। অনেকে নিজেদের বাড়ন্ত ক্ষেতের মাঝখানে বাঁশের মাথায় চুন দিয়ে আঁকাবুকি করা কেলে হাড়ি বসিয়ে রাখে। এগুলো কিন্তু কাকতাড়ুয়া নয়। এগুলো ঝুলানোর উদ্দেশ্যও হলো কুদৃষ্টি নিবারণ; তবে সেটা মানুষের। বলা বাহুল্য, উপরোক্ত উভয় প্রক্রিয়াই উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই পরিচয় বহন করে।

শিজি অপদেবতার ভর হলে শিশু যারপর নাই অস্থিরতা প্রকাশ করে। ভয় পাওয়ার মত ক্ষণে ক্ষণে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে উচ্চৈস্বরে কাঁদতে থাকে। মায়ের দুধও খেতে চায়না। যদি বা একবার মাই মুখে দিল তো পরক্ষণে হয়ত দ্বিগুণ জোরে কান্না জুড়ে দেয়। তখন কিছুতেই আর তাকে শান্ত করা যায়না। এ সময় শিশুর গায়ে কিছুটা টেম্পরেচার (তাপমাত্রা, উষ্ণতা, উত্তাপ) থাকাও বিচিত্র নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এসব ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে শিশুর কপালে কাঁচা হলুদের টিপ দিয়ে দেওয়া হয়। হাতে পায়ে এবং গলায় সরষের দানা পুঁটুলি করে বেঁধে দেওয়া হয়। মন্ত্রপড়া সরিষা হলে কথা থাকেনা, তাতেই হয়ত শিশু আরাম হয়ে যায়। কিন্তু বাড়াবাড়ি রকমের হলে তখন শিজি অপদেবতার নামে একটি কালো মুরগীর ছানা উৎসর্গ করে তার সন্তুষ্টি বিধান করতে হয়। ঘরে উঠার সিঁড়ির মুখে এই পূজা অনুষ্ঠান সম্পাদন করা বিধি। বলা বাহুল্য, অঝা বৈদ্যদের পৌরোহিত্যেই কেবল এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে।

চাকমা ভাষায় 'শিজি' অর্থ প্রকৃতপক্ষে শুচি এবং অশিজি অর্থ অশুচি। শিজি আসলে অশুচি দেবতা। চাকমারা কাউকে লক্ষ্মীছাড়া বলতে অলক্ষ্মীছাড়া বলে থাকে। তেমনি কোন এক ফাঁকে বোধ হয় এখানে অশিজি দেবতা শিজি হয়ে গেছে।

ভাতদ্যা

চাকমারা বৌদ্ধ এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে যে, যতদিন না কামনা বাসনার ক্ষয় হয় ততদিন প্রত্যেক মানুষকেই পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্ম নিতে হয়। অনেকে কৃতকর্ম দোষে মনুষ্যেতর হীনযোনীতে জন্মগ্রহন করে, আবার অনেকে অতীতের মায়া বন্ধন কাটাতে না পেরে নিজ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেই আবার জন্ম নিয়ে থাকে। এই সব মৃত আত্মীয় বর্গের সদগতি কামনায় তাদের বিগত দিনের অতৃপ্ত বাসনা পুরণের উদ্দেশ্যে চাকমারা এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। এর নাম ভাতদ্যা অর্থাৎ ভাতদান বা পিণ্ডদান। নিজ গোষ্ঠীভুক্ত লোকের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ থাকে বলে এটাকে গোষ্ঠীভাতও বলে

ভাতদ্যা অনেকটা হিন্দুদের প্রেত তর্পনের মত। তবে এতে সমষ্টিগত ভাবে গোষ্ঠীর মধ্যে বেবাক মৃতব্যক্তির জন্যই পিণ্ডদানের আয়োজন করা হয়ে থাকে আর তাই গোষ্ঠীভুক্ত সবার সক্রিয় সহযোগিতা এতে দরকার পড়ে। এর প্রস্তুতি পালা যেমন ব্যাপক তেমনি এই যজ্ঞানুষ্ঠান খুবই ব্যয়বহুল। এ কারণে ভাতদ্যা এখন বিরল। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কোন গোষ্ঠীতেই বোধ হয় এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। গোষ্ঠীর মধ্যে কতিপয় সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। যখন গোষ্ঠীভাত দেওয়া হবে বলে স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন প্রাথমিক পর্য্যায়ে গোষ্ঠীর উর্দ্ধতন পাঁচ পুরুষ কিংবা সাত পুরুষের মধ্যে সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের বিজক বা বংশ তালিকা নিখুঁত ভাবে তৈয়ার করা হয়। তারপর একটা সময় আর স্থান নির্বাচন করে কাছে কিংবা দূরে যেখানে যত সগোষ্ঠীর লোক রয়েছে সবার কাছে আমন্ত্রণ লিপি পাঠানো হয়ে থাকে। যজ্ঞের স্থান ও একটা গোষ্ঠীর লোক ধরে মত প্রশস্ত হওয়া চাই। অনুষ্ঠান শেষে এই জায়গাটা কিন্তু শ্মশানের মতই পরিত্যক্ত হয়ে

পড়ে এবং চিরকালের জন্য ঘর বসতির অযোগ্য হয়ে যায়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে গোষ্ঠীর লোক যে যেখানেই থাকুক এই নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এসে জড় হয়। সদ্যোজাত শিশু থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ কেউই বাদ পড়েনা। এই জায়গায় আগে থেকেই লোকজনের অনুপাতে সবার জন্যই সুবন্দোবস্ত করা থাকে। এখানে ভাণ্ডারঘর রসুইঘর থেকে শুরু করে সারি সদর সাময়িক আস্তানা গড়ে তোলা হয় যাতে পূজার ২/১ দিন সবাই মাথা গুঁজে থাকতে পারে। পূজার স্থানটি তখন লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। দোকান পাট বসে। এই সময় যত রকমের খাদ্য ভোজ্য জোগাড় করা সম্ভব সংগ্রহ করে ভাঁড়ারে জমা করা হয়ে থাকে। মহিষ, গরু, শূকর, ছাগল, মোরগ ইত্যাদিতো অগনিত। তাছাড়া মৃতদের চিতায় ধ্বজা পতাকা ওড়ানোর জন্যে রাশি রাশি থান কাপড়, থালা বাসন ঘটি বাটি থেকে যাবতীয় প্রকারের দান সামগ্রী ও যথেষ্ট সংখ্যায় কেনা হয়ে থাকে। তখন ভাণ্ডারঘর যেন একটা ডিপার্ট-মেন্টাল ষ্টোরের রূপধারণ করে। এ সমস্ত কিছুতে কিন্তু গোষ্ঠীর সকল লোকের কম বেশী আর্থিক সহায়তা থাকে।

ভাতভা পূজা কেবলমাত্র পূর্বে বর্ণিত প্রাচীন বৌদ্ধ পুরোহিত রুরিদের পৌরহিত্যেই সম্পাদিত হয়। তাছাড়া একাজে আরো এক ধরণের একাধিক সাহায্যকারীও থাকে যাদের বলা হয় 'লুখাক্'। এরা এই পূজার কৃত্যাকৃত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত থাকে। বলা বাহুল্য, পূর্বে বর্ণিত অঝাদের এই পূজায় কোন ভূমিকা থাকেনা। প্রাচীম ধর্মগ্রন্থ আঘর্ তারা ও রুরিদের মতই এখানে অপরিহার্য্য। এই পূজায় আঘর্ তারা থেকে পর্যায়ক্রমে ষোলটি তারা আবৃত্তি করা হয়ে থাকে। যথা :-সিগল মগল তারা অরিন্নাম তারা. সাহস ফুলু তারা, অনিচ্চা তারা, সাদেংগ্রী তারা, মালেম তারা, দশ পারমী তারা. পুহ্নম্ ফুসু তারা, চেরাগ ফুলু তারা, রাখিম্ ফুলু তারা, পুতুম্ ফুলু তারা, সামি ফুলু, বুদ্ধ ফুলু, জ্যন্ধরণ, সুব.দিশা, ত্রিপুত্ত ইত্যাদি। যজ্ঞস্থানের চারধারে আগের তৈরী বংশ তালিকা মতে মৃতদের প্রত্যেকের জন্যে এক একটা প্রতীক চিতা নির্মাণ করা হয়ে থাকে। সেগুলোতে

বংশদণ্ডের উপর 'তাংগোন্' অর্থাৎ থান কাপড়ের তৈরী সারি সারি ধ্বজা পতাকা ওড়ানো হয়ে থাকে। পূজায় আগের দিন সন্ধ্যার রুরি প্রভিটি প্রতীক চিতায় গিয়ে মন্ত্র পড়ে মৃত আত্মাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আসে। সে রাত্রে সবার জন্যে কাজের বিশেষ ভারা। কেউ কেউ পাহাড়ায় থাকে কেউ কেউ রাত্রের মধ্যে মোষ, ছাগল, শূকর, মুরগী ইত্যাদি পশু পাখী বধ করে ভোরে ভোরে রান্না চাপিয়ে দেয়। কেউ কেউ ভেগ এর পর ভেগ ভাত রাঁধে আর কেউ কেউ যত রকমের সম্ভব তরকারী রাঁধতে বসে যায়। মোট কথা সেরাত্রে প্রায় লোকেরই অনিদ্রায় কাটে।

পরদিন সকালবেলা রান্না হয়ে গেলে এক একটা *'মেজাং' এর উপর কলাপাতা পেতে ভাত আর প্রত্যেকটা পদের তরকারী দিয়ে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এক একটা 'আদারাহ্' অর্থাৎ পিণ্ডাধার সাজানো হয়ে থাকে। প্রত্যেকটাতে আবার পান সুপারী, চাকমাদের হরেক রকমের পিঠে এমনকি মদও দেওয়া হয়। এভাবে মৃতের সংখ্যা যদি পাঁচশত হয় তবে পাঁচশত আদারাহ্ সাজাতে হবে। তারপর সকলে মিলে এগুলোর এক একটাকে প্রত্যেকটা প্রতীক চিতায় বিধিমতে নিবেদন করে আসে। এই চিতাগুলোয় সব সময় পাহাড়া বসানো থাকে যাতে কুকুর কিংবা অন্য কিছুতে মুখ দিয়ে আদারাহ্ এঁটো করতে না পারে। এই করতেই বেলা হয়ে যায়। তখন রুরি আঘরতারা আবৃত্তি করে এই মহাযজ্ঞের উদ্বোধন করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এর সমাপ্তি ঘটে ততক্ষণ তাকে পর্য্যায়ক্রমে ষোলটি তারা আবৃত্তি করে যেতে হয় বিরামহীনভাবে। এই সময়ে গোল্লা ফুটে, আকাশে হাউই ছোঁড়া হয় আর ঘোর রবে ঢোল বাদ্য বাজে।

তখন সে এক হৈ হৈ ব্যাপার শুরু হয়ে যায়। চারদিকে ছুটোছুটি আর হৈ চৈ এর মধ্যে হঠাৎ করে এক একজন লোক সম্মোহিতের মত মাটিতে

---

* বেতের তৈরী ভোজন ভেড়া বিশেষ।

লুটিয়ে পড়ে আর ক্ষীণ নাকি সুরে কাঁদতে থাকে। এমনি ভাবে মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সব পদের লোকই আবিষ্ট হতে পারে। এক সঙ্গে চার পাঁচ জনেরও একই অবস্থা ঘটতে পারে। সবারই একই ধরণের আবেশ হয়ে থাকে। স্বপ্নাবিষ্টের মত সবারই বিহ্বল ভাব, সবারই দু'চোখ বোঁজা। তখন বিজক্ অর্থাৎ মৃতদের বংশতালিকা হাতে লোক ছুটে যায় তাদের কাছে আর তুমি কি অমুক এসেছ, সমুক এসেছ ইত্যাদি বলে মৃত আত্মীয়দের নাম ধরে তাদের জিজ্ঞেস করতে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ না তার পূর্বজন্মের নাম এসে পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সে শুধু নাকি সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতেই থাকে। আর যখন তালিকাটা তার পূর্ব জন্মের সঠিক নামে এসে ঠেকে তখন হঠাৎ লোকটার কান্না থেমে যায় এবং চোখ বোজা অবস্থাতেই ইঙ্গিতে স্বীকার করে, হ্যাঁ, তার নাম তাই ছিল বটে। তখন তাকে ফের জিজ্ঞেস করা হয়, তার ইচ্ছে কি? কি পেলে সে ভালো হয়ে যাবে। তারপর যেন বহু দুরাগত শব্দের মত অতি ক্ষীণস্বরে তার উত্তর ভেসে আসে। কেউ হয়তঃ বলে, গত জন্মে আমার অমুক জিনিষটা খেতে সাধ হয়েছিল কিন্তু আমার ছেলে কিনে দেয়নি। সেই দুঃখ নিয়েই আমাকে মরতে হয়েছে। তখন খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যায় সে জিনিষটার জন্যে। তার আগের জন্মের ছেলে তখনও যদি বেঁচে থাকে, তার কাছে হয়তঃ জানা যাবে সত্যি সে টাকার অভাবে তার বাবাকে সে বিশেষ জিনিষটা খেতে দিতে পারেনি। তখন যেখান থেকে হোক, যত মূল্যেই হোক সে জিনিষটা কিনে এনে আদারাহ্নত্তে নিবেদন করে দিতে হবে যেটা তার জন্যে নির্দ্দিষ্ট করা থাকে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এজন্যে সম্ভাব্য অসংখ্য পদের দান সামগ্রী পূর্বাহ্নেই ভাণ্ডার ঘরে প্রচুর পরিমাণে এনে জমা রাখা হয়ে থাকে। এদিকে তৎক্ষনাৎ লোকটার মোহাবেশ কেটে যায় আর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়ায়। কারো কারো দাবী খুব সামান্যই থাকে। হয়তঃ একটা চাকমা পিঠা কিংবা কোন এক পদের তরকারি। কারো কারো আবার থালা ঘটি, বাটি এমনকি, গরু মোষের বায়নাও থাকে। কোন বাচ্চা মেয়ে আবার

এ সময় ভাবগ্রস্থ হয়ে বলতে শুনা গেছে, আমার গত জন্মের স্বামী আবার গড়িয়ে দেবে বলে আমার অমুক পদের গয়না নিয়ে বেচে দেয়, কিন্তু সে আর দেয়নি। সেই দুঃখ আমার বুকে কাঁটার মত বিঁধে আছে। মেয়েটি হয়তঃ জন্মেও তার গত জন্মের স্বামী লোকটাকে দেখেনি। কিন্তু তার কাছে জানা যাবে, সত্যিই সে তার স্ত্রীর জীবিত কালে ঐ পদের গয়না নিয়ে অর্থাভাবে গড়িয়ে দিতে পারেনি মেয়েটি সে জন্মে তার কি নাম, তার কত ছেলেমেয়ে ছিল, কোন বছর তারা কোথায় কোথায় জুম করেছে ইত্যাদি বিষয়ও ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে। তখন তাকে সেই পদের গয়না কিংবা তার বাজারজাত মূল্য অবশ্যই ধরে দিতে হবে। এই অবস্থায় যদি কোন ইপ্সিত বস্তু দুর্লভ হয়ে পড়ে এবং কিছুতেই তা পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনা, তবে সংশ্লিষ্ট মেয়ে বা পুরুষ সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা জন্মের মতই পাগল হয়ে যায়। এমনও জানা যায়, ভাতত্থায় রুরি কর্তৃক উচ্চারিত মন্ত্রের শ্রুতি সীমার মধ্যে অনেক সময় গরু, ছাগল, শূকর ইত্যাদিও এভাবে হঠাৎ আবিষ্ট হয়ে পড়ে। বুঝতে কষ্ট হয়না যে, এরা কর্মদোষে মনুষ্যেতর জন্ম লাভ করেছে। এই পশুযোনী থেকে এদের মুক্তির জন্য কোন কিছু করা সম্ভব নয় বলে এরা সে অবস্থাতেই প্রাণ-ত্যাগ করে।

দিনের শেষে কিংবা যখনই খুব বেশী সংখ্যায় লোক ভাতত্থায় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়তে শুরু করে তখন অবস্থা পর্যালোচনা করে পূর্বোক্ত রুরির সহকারী লুথাক্ বাকী আদারাহ্গুলো থেকে কিছু কিছু খেয়ে সেগুলো এঁটো করে দেয়। তখন লোক আবিষ্ট হয়ে আবিষ্ট হয়ে পড়লে তাদের পড়া বন্ধ হয়ে যায়। একসঙ্গে বেশী লোক সামলানো এবং যথোচিত খোঁজ খবর করা সম্ভব হয়না, তাই রুরিও সেখানেই মন্ত্রোচ্চারনে ইতি টানে।

ভাতত্থা প্রত্যক্ষ করেছেন কিংবা নিজে ভাতত্থায় আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন এমন লোক সমাজে খুব বিরল। যারা আবিষ্ট হয় তখন সে অবস্থায় তারা যা করে কিংবা যা' কিছু বলে, জ্ঞান ফিরে আসার পর তাদের নাকি

সেসব কিছুই মনে থাকেনা। শুধু স্বপ্নের মত একটা অস্পষ্ট অনুভূতি জেগে থাকে, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। হয়তঃ সাময়িক কালের জন্য সেসব লোক জাতিস্মর হয়ে যায়।

বৌদ্ধ জাতকমালার প্রথম খণ্ডে মতকভত্ত জাতক নামে একটা কাহিনী আছে। এতে দেখা যায়, বুদ্ধের সময়ে এমনকি বুদ্ধের জন্মেরও বহু পূর্ব থেকে ভারতে পশু পাখী বধ করে মৃতদের উদ্দেশ্যে ভাতদান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা চাকমাদের ভাতত্যা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এদা দাগা

বাংলার একটা কথা আছে, 'ওরে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া'। চাকমাদের মধ্যে এই কথাটার একটা অদ্ভুত বাস্তব নজীর রয়েছে। এক্ষেত্রে কিন্তু আত্মারামকে আবার বিশেষ প্রক্রিয়ায় খাঁচায় ফিরিয়ে আনা যায়। এটাকে ভাতত্যার একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংস্করণ বলা চলে। হাঁটি হাঁটি পা পা এই বয়সের বাচ্চা ছেলেমেয়ে হঠাৎ যদি খুব ভয় পায়, অনেক ক্ষেত্রে সে ভয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়ে। ছেলেটার বাবা মা, যাদের সে খুব ন্যাওটা অনেক সময় তাদেরই কেউ রাগের বশে ছেলের উপর তর্জন গর্জন করে এরূপ বিপত্তি ঘটিয়ে থাকে। তখন বাচ্চাটা ঘাড় সোজা রাখতে পারেনা. চোখ বোঁজা অবস্থায় ভাতত্যায় আবিষ্ট হয়ে পড়া লোকের মত একঘেঁয়ে ভাবে কাঁদতে থাকে আর অল্পেতে শিউরে উঠে। এসময় হয়তঃ গা সামান্য গরমও হ'য়ে থাকতে পারে। সহসা এর উপশম ঘটাতে না পারলে ছেলের প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। এ অবস্থাকে বলে 'এদা জুরানা' অর্থাৎ কিনা আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হওয়া।

যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এরূপ ছেলেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, তাকে বলে 'এদা দাগা' এই অনুষ্ঠানে কোন দেবতার পূজা হয়না। এবং বিশেষ কোন মন্ত্রোচ্চারণেরও কোন বালাই নাই। অঝা বা যে কোন

অভিজ্ঞ লোক এব্যাপারে পৌরহিত্য করতে পারে। এ অনুষ্ঠানেও ভাতত্যার মত 'মেজাং' এর উপর আগ্ কলাপাতা পেতে আদারাহ্ সাজাতে হয়। তবে সেখানে ভাত তরকারী ইত্যাদি কিছুই দিতে হয়না। উপকরণের মধ্যে লাগে কলা, আখ, আখের গুড়, ছ'য়েকখানা 'বেও্ পিঠা' আর একটি টাকা। আগের দিনে রূপোর টাকা দেওয়া হত। একাধিক দিলেও ক্ষতি নাই। অনুষ্ঠান শেষে এগুলোতে সুতা জড়িয়ে কিংবা গোট লাগিয়ে ছেলে কিংবা মেয়ে তাকেই পরতে দেওয়া হয়। আদারাহ্তে আর একটা সিদ্ধ করা মুরগীর বাচ্চাও দিতে হয়। যার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নরূপ —

মুরগীর বাচ্চাটাকে জবাই করে সেটার পালক ছাড়িয়ে নাড়িভুঁড়ি ফেলে মাথাটাকে ঘুরিয়ে এনে কণ্ঠার ছিদ্র দিয়ে পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিতে হবে। সেটাকে সেভাবে সিদ্ধ করে গোটাটাই আদারহ্তে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সময় ছেলের মা বাচ্চা কোলে বাড়ীর সদর দরজায় বসে থাকে আর নীচে মাটিতে অঝা আদারাহ্ বসায়। আদারাহ্ বসানো মেজাং এর সঙ্গে সাতগাছি সুতো বেঁধে তার অপর প্রান্ত ছেলের মা হাতে ধরে থাকে। আদারাহ্ যার জন্যে সে যদি ছেলে হয় তবে একখানা গামছা দিয়ে আর মেয়ে হলে একখানা 'খবং' কিংবা খাদি দিয়ে আদারাহ্টা ঢেকে দিতে হয়। সব কিছু ঠিক ঠাক হয়ে গেলে অঝা আদারার ঢাকনা ঈষৎ ফাঁক করে এদা ডাকে,—পাত্তুরু-তুরু, ত বাবে কেচ্ কেজেয়্যো, তম্মা কেচ্ কেজেয়্যো ইত্যাদি ইত্যাদি। যার ভাবার্থ হলো, তোকে বাপ, শাসিয়েছে, মা খেদিয়েছে, এখন তারা তোকে কলা দিয়েছে, আখ দিয়েছে, আয়! আয়! তোর জিনিষ তুই বুঝে নে। অঝা একখানা গামছা দিয়ে ডাকার মত করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এভাবে ডাকে যতক্ষণ না একটা মাছি এসে আদারাহ্তে বসে। মাছি বসলে তখন আদারাহ্ তুলে নিয়ে ছেলেকে গছানো হয় অর্থাৎ তার সামনে ধরা হয়ে থাকে। সে সেখান থেকে যা' খুশী একটা কিছু হাতে তুলে নেয়। তারপর ভালো হয়ে যায়।

ব্যূহচক্র

বৃটিশ আমল থেকে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিনে রাঙ্গামাটিতে একটা উৎসব মহা সমারোহে উদযাপিত হয়ে আসছে। এর নাম ব্যূহচক্র মেলা। এখন স্থানীয় আনন্দ বিহার প্রাঙ্গনে এই মেলা বসলেও তখনকার দিনে রাঙ্গামাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়েই এই উৎসবের অনুষ্ঠান করা হত। ব্যূহচক্র রচনা করা হত স্কুলের লাগোয়া উত্তর পূর্ব কোণের জমিটাতে। এ জায়গাটা তখন খালি ছিল। স্কুলের পাহাড়ী বৌদ্ধ ছাত্রেরা ছিল এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। হিন্দু ছাত্রদের যেমন সরস্বতী পূজা পাহাড়ী ছাত্রদের জন্যও তখন মাঘী পূর্ণিমার এই অনুষ্ঠান ছিল অবশ্য করণীয়। প্রতি বৎসর যারা অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে প্রমোশন পায় তাদেরই এ উৎসবে অগ্রনী ভূমিকা নিতে হত। ওরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাঁদা তুলত, জঙ্গল থেকে নিজেরাই বাঁশ কেটে এনে ব্যূহচক্র তৈরী করত। রাঙ্গামাটি জেলখানার পর থেকে উত্তরে রিজার্ভ বাজার এরিয়া পর্য্যন্ত এই এলাকাটা তখন ছিল সরকারের সংরক্ষিত গভীর বন। মাঘী পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে ব্যূহ তৈরীর জন্য এখান থেকে প্রয়োজনমত বিনা শুল্কে বাঁশ আহরণের জন্য বনবিভাগের অনুমতি পাওয়া যেত। পূর্ণিমার আগের দিনই ব্যূহচক্র নির্মাণ শেষ হয়ে যায় আর তার পরদিনই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা সর্ব সাধারণের প্রবেশের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ব্যূহের কেন্দ্রস্থলে থাকে বুদ্ধমূর্ত্তি। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে নানা গোলকধাঁধাঁ পেরিয়ে এখানে পৌঁছে বুদ্ধ পূজা করার মধ্যে একজনের ব্যূহচক্র পরিভ্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটে। এটা অনেকটা গোলকধাম খেলার মত। মাঝে মাঝেই এখানে আসলে পুনঃ সংসারে পতনের মত অবস্থা প্রায় লোকের ভাগ্যেই ঘটে। তখন হাসাহাসির ধুম পড়ে যায়। এই ব্যূহচক্র মেলায় তখনকার দিনেও বেশ লোক সমাগম হত। অনেকে মজা করে ব্যূহের মধ্যে ঘুরতে আসতেন। এখানে কিন্তু জুতা পায়ে প্রবেশ নিষেধ। ছেলেরা অভ্যাগতদের লুচি আর মিষ্টান্ন দিয়ে

আপ্যায়ন করত। নিজেদের মধ্যে চলত দৈ খাওয়ার মহোৎসব। তখন অবশ্য এখনকার মত চায়ের চল ছিলনা।

সন্ধ্যায় প্রদীপ পূজা। এর জন্যে ব্যূহচক্রের প্রতি বেড়ার মাথায় এক একখানা বাঁশের কালি লাগানো থাকে যার খাঁজযুক্ত অংশটা থাকে উপরমুখো হয়ে। পুণ্যার্থী নর নারীরা কেন্দ্রস্থলে বুদ্ধমূর্ত্তির সামনে এবং এ সমস্ত বাঁশের কালিতে সারি সারি মোমের বাতি জ্বালিয়ে দেয়। তখন সমস্ত পূজা মণ্ডপ অপূর্ব আলোক মালায় ঝলমল করে উঠে। এদিকে তখন একটার পর একটা ফানুস ওড়ানো শুরু হয়ে যায়। এমনিভাবে সারাদিনের উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৩৪ ইংরেজীতে স্থানীয় আনন্দ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে আনন্দবিহার পরিচালনা কমিটি এই ব্যূহচক্র মেলা উদযাপনের ভার গ্রহণ করেন আর তখন থেকে আনন্দবিহার প্রাঙ্গনেই এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে আসছে। এখন একটা কথা বলা প্রয়োজন যে এই ব্যূহচক্র কিন্তু হিন্দুদের অভিমন্যু বধের চক্রব্যূহ নয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রতীত্য সমুৎপাদ বলে একটা অধ্যায় আছে। এই প্রতীত্য সমুৎপাদ "দ্বাদসাঙ্গে" বিভক্ত *। মানুষ তথা সমস্ত জীব জগত কিভাবে এবং কিসের আকর্ষণে পুনঃ পুনঃ জন্ম এবং মৃত্যুর পথে ধাবমান ভগবান বুদ্ধ তা দ্বাদশভাগে ভাগ করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে। এক কথায় এই হচ্ছে ভবচক্র এবং এই চক্র অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ থেকে আপন চেষ্টায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার নামই নির্ব্বান।

---

* অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরামরণ ইত্যাদি।

বিঝু

ফী বছর চৈত্রমাস আসতেই এ অঞ্চলে একটা পাখী এসে ডাকে,—বিঝু ! বিঝু !! বিঝু !!! চাকমারা একে বলে বিঝু পেইক্ বা বিঝু পাখী। সম্বৎসরে বিঝু চাকমাদের সবচেয়ে বড় পরব। মুসলমানদের যেমন ঈদ, হিন্দুদের যেমন দুর্গাপূজা, চাকমাদের তেমনি বিঝু উৎসব। চৈত্রের শেষ দুদিন আর পহেলা বৈশাখ নিয়ে তিনদিন চাকমারা মহাসমারোহে বিঝু পরব উদযাপন করে। প্রত্যেক বছর পাখীটা এসে যেন আগে ভাগে সেই বিঝুর আগমনী জানান দিয়ে যায়। তখন ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে যায় আর তখন থেকে প্রতি ঘরে ঘরে নীরবে বিঝু পরবের জন্য প্রস্তুতি চলে। পর্য্যায়ক্রমে যে তিনদিন ধরে বিঝু উৎসব চলে, চাকমারা তাকে বলে যথাক্রমে ফুল বিঝু, মূল বিঝু, এবং গোজ্যেই পোজ্যা দিন। এই তিনদিন চাকমারা কোন প্রাণীহত্যা করেনা। কাজেই তার আগের দিনেই যা' কিছু মুখরোচক খাবার দাবার পরবের জন্যে সংগ্রহ করে রাখতে হয়। তা'ছাড়া মূল বিঝু দিনের জন্য পানীয় মদ জগরা দু'তো পূর্বাহ্নেই ঘরে ঘরে দেদার পরিমাণে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, বিঝু উৎসব কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন বৌদ্ধ পর্ব নয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে কোথাও বিঝু পরবের উল্লেখ পাওয়া যায়না। সেই আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধের সময়ে বাংলা সন চালুই ছিলনা। এটা বোধহয় অনেক পরবর্তী কালের বাংলার একটা সার্বজনীন মহোৎসব। বাঙ্গালী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে চাকমারা এতে কিছুটা ধর্মীয় আলপনা দিয়ে নিজেদের মত করে এটাকে আপন করে নিয়েছে। আর কালে কালে এটাই এখন তাদের মুখ্য পরবের রূপ নিয়েছে। মারমাদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। এই পরবকে চাকমারা বলে বিঝু আর মারমারা বলে সাংগ্রাই। দুটোই বাংলার অপভ্রংশ। বিঝু অর্থ হলো বিষুব সংক্রান্তি আর সাংগ্রাই যে সংক্রান্তি সে তো বলাই যায়।

ফুল বিঝু

চৈত্র শেষের আগের দিন ফুল বিঝু উৎসব। এই দিনে পাড়ার সবাই খুব ভোরে উঠে বাড়ীর অঙ্গন প্রাঙ্গন ঝাঁট্পাট দিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে রাখে, তারপর গাঁয়ের পার্শ্ববর্তী নদী বা ছড়াতে গিয়ে স্নান করে আসে। ছেলে পিলেরা হরেক রকমের ফুল তুলে এনে ঘরদোর সাজায়। এই সময় এক রকমের বুনো ফুল ফুটে। চাকমারা এ ফুলকে বলে বিঝু ফুল। এ ফুলকে আবার ভাতজরা ফুলও বলা হয়ে থাকে। অনেকে নদীর ঘাটে গঙা অর্থাৎ জলদেবীর উদ্দেশ্যে ফুল দিয়ে আসে। কেউ কেউ ঘিলা, কজই আর সোনা রূপার পানি ছিটিয়ে ঘর পরিশুদ্ধ করে। ধারে কাছে বৌদ্ধ বিহার থাকলে দলে দলে বিহারে গিয়ে বুদ্ধ বন্দনা, ফুল পূজা, প্রদীপ পূজা করে। ভিক্ষু বন্দনা করে ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করে। ফুল বিঝুর দিন বিহারে বিহারে সমবেতভাবে বিহারের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলো স্নান করানো হয়ে থাকে। এইদিন এবং উৎসবের বাকী দুইদিন দৈনন্দিন কাজকর্ম বন্ধই থাকে। ছেলেপিলেরা ছোট ছোট টুকরিতে ধান নিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে হাঁস মুরগীদের খেতে দেয়। অনেক যুবক যুবতী এই দিনে এবং মূল বিঝুর দিন কলসী কলসী জল তুলে পাড়ার বুড়ো বুড়ীদের গোসল করিয়ে তাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করে। এভাবেই হাসি গল্পের মধ্যে দিনটা যায়। এইদিনে মদ খাওয়া হয়না। সাঁঝের বেলায় সবাই আবার বিহারে যায়। কেউ কেউ জলের ঘাটে, দোর গোড়ায় এমনকি গোশালায় পর্যন্ত সারি সারি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। সারা গ্রাম তখন আলোক মালায় ঝলমল করে উঠে।

মূলবিঝু

বছরের শেষ দিন মূল বিঝু উৎসব। বিঝু পরবের মূল উৎসব এই দিনেই হয়। এই দিন খুব ভোরে সবার ঘরে ঘরে পাজন্ রান্না করা হয়ে থাকে।

পাজন্ অনেকটা ঘন্টের মত। কমপক্ষে পাঁচ পদের মিশ্রিত আনাজপাতি দিয়ে রান্না করা হয় বলে একে পাজন্ বলে। অর্থাৎ কিনা পাঁচ মিশালী। কার ঘরের পাজন্ বেশী মুখরোচক হতে পারে তাই নিয়ে ঘরে ঘরে তখন একটা নীরব প্রতিযোগিতা চলে। পাজন্ ছাড়া বিঝু উপলক্ষে রকমারি খাবার দাবারও প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। বিন্নি ধানের খৈ, তিলের নাড়ু, হরেক রকমের চাকমা পিঠে এবং সিদ্ধ করা মিষ্টি আলু ইত্যাদি প্রায় সবার ঘরে ঘরে বিঝুর দিনে খেতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ এখন বাঙ্গালীদের ধরণে সেমাই, পায়েস ইত্যাদিও তৈয়ার করে থাকে।

মূলবিঝুর দিন সকাল থেকেই ঘরে ঘরে খাওয়ার পালা চলে। এইদিন সবার জন্যে অবারিত দ্বার। সকাল থেকে সবাই দলে দলে বার হয়ে পড়ে আর সারাদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে পাজন্ থেকে শুরু করে বিবিধ খাবার খেয়ে বেড়ায়। তাছাড়া মদ, জগরাহ্ অর্থাৎ বিন্নিধানের অপরিশ্রুত মিষ্টি মদ ইত্যাদিতো প্রতি ঘরেই অপরিহার্য। এভাবে খেতে খেতে অনেকে পাড়া ছাড়িয়ে ভিন পাড়ায় চলে যায়। এদিন আর প্রায় কারোরই বাড়ীতে খাওয়া হয়না। মূল বিঝুর দিন এত অজস্র খানাপিনা চলে যে এই নিয়ে চাকমাদের মধ্যে একটি বাগ্ধারাই চালু হয়ে গেছে। কারো কোন সময় মেলা খানা জুটে গেলে সবাই তখন বলে,—'তা মুঅত্ ইচ্যা বিঝু পোঝ্যো'—অর্থাৎ কিনা আজ বিঝুদিনের মত অঢেল খানা তার মুখে এসে ভর করেছে।

পাড়ায় উঠতি বয়সের মেয়ে থাকলে এই বিঝুর দিনে প্রথম বারের মত তাদের খাদি অর্থাৎ কাঁচুলীর মত বুকের কাপড় পরতে দেওয়া হয় আর তখন থেকে ওরা পূর্ণ যুবতীর মর্য্যাদা লাভ করে থাকে। অপরাহ্নে পাড়ার মাঝখানে ছায়াবহুল বটগাছের নীচে গাবুজ্যা গাবুরী অর্থাৎ যুবক যুবতীদের খেলার আসর জমে। ঘিলাখারা, পোত্তিখারা ইত্যাদি খেলায় পাড়ার যুবতীদেরও অংশ থাকে। অনেক সময় উভয় দলের মধ্যে

প্রতিযোগিতাও চলে। আগেকার দিনে যুবক যুবতীদের বিঝুর সময় দলবেঁধে সমতলের পাহাড়তলী মহামুনি, রাজানগর ইত্যাদি জায়গায় বুদ্ধমেলায় যেতে দেখা যেত। চাকমারা পাহাড়তলী মহামুনি মেলাকে বড় কদলপুর এবং রাজানগর বুদ্ধ মেলাকে চিগোন অর্থাৎ ছোট কদলপুর বলে। এখনও এসব জায়গায় ফী বছর চৈত্র সংক্রান্তির সময় বিরাট বুদ্ধমেলা বসে এবং বেশ কিছুদিন স্থায়ীও হয়। কিন্তু নানাবিধ কারণে এখন আর সেসব জায়গায় পাহাড়ীদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়না। বস্তুতঃ এসব জায়গায় বিরাট বিরাট বুদ্ধ মুর্ত্তিগুলো দুর অতীতে উপজাতীয় রাজ রাজড়ারাই প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

গোজ্যেই পোজ্যাদিন

পহেলা বৈশাখ গোজ্যেই পোজ্যা দিন। এদিন বিঝু উৎসবের শেষ দিন। গোজ্যেই পোজ্যা দিনের অর্থ গড়াগড়ি যাওয়ার দিন। আগের দিনের যথেচ্ছ মাতামাতি, হৈ হুল্লোড় আর অবারিত খানাপিনার ধকল সামলাতে পরের দিন গড়াগড়ি খাওয়ারই কথা। তবে এর বিপরীতেও একটা কথা আছে। দুর অতীতে মূল বিঝুর দিনে নাকি খাওয়া দাওয়ার পাট ছিলনা। এইদিন সবাই ধর্ম কর্মে রত থাকতো। মদ ভাং খাওয়া চলত না। বছরের শেষ দিনটাকে সবাই বুদ্ধপূজা, ভিক্ষু সেবা, ধর্মকথা শোনা ইত্যাদি ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে বিদায় দিত। আর পহেলা বৈশাখ এমন পান ভোজনের স্রোত বয়ে যেত যে দিনের শেষে সবাইকে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে হত। এ জন্যেই নাকি এ দিনের নাম হয়েছে গোজ্যেই পোজ্যা দিন।

এখন গোজ্যেই পোজ্যা দিন বলতে গেলে বিশ্রামের দিন হিসেবেই উদযাপিত হয়ে থাকে। এই দিন আবার মুসলিম পর্ব ঈদ এর মত কোলা-

ফুলির দিনও বটে। ছোটরা বড়দের বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রণাম করে তাদের আশীর্বাদ নেয়। অনেকে সামার্থ্যানুসারে পাড়ার বুড়ো বুড়ীদের কাউকে ডেকে এনে সযত্নে দুটো ভালমন্দ খাওয়ায়। অনেক ধর্মপ্রাণ নরনারী আবার উৎসবের তিনদিন বিহারে গিয়ে সকাল সন্ধ্যা ধর্ম কর্মে রত থাকে। বিঝুর সময় প্রায় বিহারেই অপরাহ্নে ধর্মসভা বসে। ঐ সময়ে বর্ণাঢ্য পোষাকে সজ্জিত ধর্ম পিপাসু নর নারীর ভিড় জমে। এভাবেই সমারোহের ভিতর দিয়ে চাকমাদের বিঝু পরবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কঠিন চীবর দান

বিগত ১৯৭৩ ইংরেজী থেকে চাকমারা প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের পুর্ণিমা তিথিতে একটা মহাদান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে আসছে, যার নাম কঠিন চীবর দান। চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সুতা কেটে, রং করে, কাপড় বুনে, চীবর সেলাই করে মহাসাধক শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির,-যিনি বনভন্তে নামে সমধিক পরিচিত, তাঁকে এই মহাদান দেওয়া হয়ে থাকে। কিঞ্চিদধিক আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বুদ্ধ শিষ্যা মহোপাসিকা বিশাখা সর্বপ্রথম এই মহাদান যজ্ঞের প্রবর্ত্তণ করেন। বর্ত্তমানে বৌদ্ধ জগতে আর কোথাও এই প্রকার মহাদান দেওয়া হয় বলে জানা যায়না।

কঠিন চীবর দানের প্রথা উৎপত্তি সম্পর্কে বৌদ্ধ সাহিত্যে এইরূপ একটা বিবরণ পাওয়া যায়। বুদ্ধ এক সময়ে শ্রাবস্তীতে অবস্থান কালে ৩০ জন পাবেয়্যবাসী ভিক্ষু বর্ষাবাস শেষে বুদ্ধ দর্শনের জন্যে শ্রাবস্তীতে আগমন করেন। দীর্ঘ তিনমাস কাল একটানা ব্যবহারের ফলে ভিক্ষুদের চীবর তখন জীর্ণ এবং প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। কথিত আছে মহোপাসিকা বিশাখার একজন পরিচারিকা আহারের জন্যে এই ভিক্ষুদের আহ্বান করতে বিহারে গেলে তাঁদের নগ্নগাত্রে স্নানরত দেখতে পায়। এই বিষয় মহোপা-

সিকাকে অবগত করানো হলে তিনি স্বয়ং বুদ্ধের কাছে গিয়ে ভিক্ষুদের পরিধেয় বস্ত্রের শোচনীয় জীর্ণদশার কথা জানতে পারেন। তখন তিনি বুদ্ধের আদেশ, উপদেশ নিয়ে এক অহোরাত্রের মধ্যে বিপুল অর্থব্যয়ে যথেষ্ট সংখ্যক চীবর প্রস্তুত করে নিয়ে পরদিন অরুণোদয়ের পূর্বেই ভিক্ষুদের কঠিন চীবর দান করেন। বস্তুতঃ ভিক্ষুদের চীবরের অভূতপূর্ব দৈন্যদশাই বোধ হয় ব্যাপারটাকে যতদুর সম্ভব ত্বরান্বিত করতে মহোপাসিকাকে অনুপ্রাণিত করে তোলে। অতঃপর এই থেকে প্রতি বৎসর ভিক্ষুদের বর্ষাবাস সমাপ্তির পরবর্ত্তী একমাস অর্থাৎ আশ্বিনী পূর্ণিমার পরদিন থেকে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময়কালের মধ্যে বিহারে বিহারে বর্ষাবাস সমাপনকারী ভিক্ষুদের কঠিন চীবর দান করার প্রথা চালু হয়ে পড়ে। জগতে যত প্রকার ঐহিক দান আছে, বুদ্ধ দেশনামতে কঠিন চীবর দান তাদের মধ্যে মহোত্তম এবং মহৎফল প্রদায়ী। কিন্তু বর্ত্তমান বৌদ্ধ জগতের সর্বত্র পূর্বে প্রস্তুত চীবর দিয়েই এখন এই দানকার্য্য সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

বনভন্তের মত বিদর্শনাচারী একজন আদর্শ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাক্ষাৎ লাভ করে চাকমাদের মনে মহোপাসিকা বিশাখার প্রবর্ত্তিত বিধিমতে তাঁকে কঠিন চীবর দান দেওয়ার অনুপ্রেরণা জাগে। কিন্তু একক প্রচেষ্টায় এই মহাদান যজ্ঞ সম্পাদন করার অসুবিধা দেখে বহু ধর্মপ্রাণ চাকমা নরনারী তখন একত্র হয়ে সমবেতভাবে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯৭৩ ইংরেজীর ৬ই নভেম্বর তারিখে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রথম বারের মত চাকমারা বনভন্তেকে কঠিন চীবর দানে সক্ষম হন। শ্রদ্ধেয় ভন্তে তখন তিনটিলা বনবিহারে অবস্থান করছেন। এই প্রথম মহাদান কার্য্যে সূতা কাটার জন্য ৯৬টি চরকা এবং বয়নের জন্য ৩৩ খানা বেইন অর্থাৎ কোমর তাঁত সংগৃহীত হয়। কাজের বিভিন্ন স্তরে কাজ করার জন্য দুই শতাধিক পুরুষ ও মহিলা স্বেচ্ছাকর্মী এতে অংশ গ্রহণ করেন। অবশ্য সমগ্র কর্মকাণ্ডে মহিলা কর্মিদের ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক। এ বিষয়ে তাঁদের প্রশংসনীয় ভূমিকা সবার

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে চাকমা মহিলারা একে একে প্রায় সবাই বয়নশিল্পে বিশেষ পারদর্শিনী আর তাতেই প্রতি বছর এ রকম একটা মহাদান যজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে উঠে।

কঠিন চীবর দানের জন্য নির্দ্ধারিত তারিখের আগের দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে চরকা কাটা দিয়ে এই পুণ্য কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক বৎসর এই অনুষ্ঠানে প্রায় শতাধিক চরকা এবং সম সংখ্যক বেইন এসে যায়। পুণ্যকামী ধর্মপ্রাণ নরনারীরা নিজেরাই এগুলো নিয়ে আসেন এবং তা দিয়ে নিজেরা কাজ করে পুণ্যকাজে সরিক হন। কিছু সুতা জমে গেলে তখন থেকে দ্বিতীয় কর্মিদলের কাজ শুরু হয়ে যায়। সুতা লাণ্ডা ঝাড় দেওয়া, ত্যানা ইত্যাদি এই দলের কাজ। এই দলে কিছুটা অগ্রগতি হলে তখন তৃতীয় কর্মিদল সুতা রং করা কাজে লেগে যায়। কার্য্যোপযোগী কিছু সুতা রং করা হয়ে গেলে তখন থেকে তাঁতের কাজ শুরু হয়ে যায় আর এভাবে সারারাত একটানা পর্যায়ক্রমিক কাজ চলে। ভোরে ভোরে প্রায় তাঁতের কাজই শেষ হয়ে আসে। তখন থেকে ফের অপর দল চীবর সেলাইয়ের কাজ হাতে নেন। এভাবে কাজ করে নির্দ্ধারিত সময় সূচীর আগেই সম্পূর্ণ ত্রিচীবর দান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

১৯৭৫ ইংরেজী থেকে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে রাঙ্গামাটির উপকণ্ঠে রাজ বনবিহারে অবস্থান করছেন। প্রতি বছর এখানে কঠিন চীবর দানোৎসব উপলক্ষে দূর দুরান্ত থেকে বহু পুণ্যার্থী বৌদ্ধ নর নারীর সমাগম ঘটে। রাজবন বিহারে তখন একটা মেলার মতই ভিড় জমে উঠে। এই সময় এই অঞ্চলের ভিক্ষু সংঘ ব্যতীত সমতলের বিশিষ্ট ভিক্ষুদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। তাছাড়া দেশী বিদেশী বহু পর্যবেক্ষক চাকমাদের এই মহাদান যজ্ঞ প্রত্যক্ষ করার জন্য এই সময় রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে পদার্পন করে থাকেন।

বিবাহ

চাকমা ভাষায় বিয়েকে বলে 'মেলা'। উপযুক্ত বয়সেই চাকমা ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়ে থাকে। বাল্য বিবাহ সমাজে অচল। পাত্রীর বয়স কমপক্ষে ১৫/১৬ আর ছেলের বয়স বিশ বছরের কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক। এমনি বয়সে প্রায় ছেলে মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। শিক্ষিতদের মধ্যে বিয়ের বয়স অবশ্য শিক্ষা সমাপ্তির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সমাজে কারো ছেলে বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠলে পাল্‌টি ঘর দেখে ছেলের বাপ উপযুক্ত দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে সে বাড়ীতে কনে দেখতে যায়। দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে মদ অপরিহার্য্য। তা' আবার যত কড়া হতে পারে তত উত্তম। পান্‌সে মদ নিলে সাধারণের বিশ্বাস মতে, সমস্ত ব্যাপারটাই নাকি পান্‌সে হয়ে যায়। চাকমা সমাজে মদটা এক ধরণের সম্মানের প্রতীক। এমনিতে কেউ কারো কাছে এক বোতল মদ নিয়ে তার দ্বারস্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সেটা রাজসিক সম্মান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কারো কাছে কোন অপরাধে ক্ষমা চাইতে হলেও এক বোতল কড়া মদ নিয়েই ক্ষমা চাওয়া বিধি। অন্যান্য উপকরণের মধ্যে থাকে জোড়ায় জোড়ায় নারিকেল, প্রচুর পান সুপারী আর হরেক রকমের তেলেভাজা এবং ভাপে সিদ্ধ চাকমা পিঠে। পিঠের মধ্যে 'বিনিপিঠা' অর্থাৎ বিন্নিধান থেকে প্রস্তুত পিঠে থাকা চাই। যেহেতু উহা আঁঠাল, তাই সম্বন্ধ ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে বলে সাধারণের বিশ্বাস। পুরোপুরি সম্বন্ধ ঠিক করতে হলে একাধিকবার কনে দেখতে যেতে হয়। প্রায় ক্ষেত্রে তিনবারেই পাকা কথা হয়ে যায়, তাই শেষবার কনে দেখতে যাওয়াকে চাকমা ভাষায় 'তিনপুর' বলে।

চাকমা সমাজে কন্যাপণ প্রথা বিদ্যমান। বর্ত্তমানে শিক্ষিত সমাজে এর কোন অস্তিত্ব না থাকলেও গ্রামের সাধারণ আবেষ্টনীর মধ্যে আজো বিয়ে করতে হলে কনের জন্য বরকে নির্দ্ধারিত পণ আদায় করতে হয়। চাকমা

ভাষায় কন্যাপণকে বলে 'দাভা'। দাভা ছাড়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কন্যাপক্ষের দাবীমতে নগদ টাকা, চাউল, শূকর ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে কনের বাপকে সহায়তা দিতে হয়। এগুলোকে এক কথায় বলা হয় 'উবোর্ খজ্জি'। বিয়ের সময় কনেকে যে সব বস্ত্রালঙ্কার দেওয়া হয় সেগুলোকে বলে 'বৌয়ালী'। 'তিনপুরের' দিন কনের বাপের বাড়ীতে ছোটখাট একটা ভোজসভা বসে। এ সময় বরকর্তা কন্যাকর্তাকে প্রচুর মদ এবং বিবিধ উপঢৌকন দিয়ে তার কাছ থেকে পাকা কথা নিয়ে নেয়। এ অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'মদ পিলাং' গছানো। চাকমা ভাষায় হাঁড়ি পাতিলকে বলে 'পিলা'। এ অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাঁড়ি মদ লাগে। এ কারণেই বোধ হয় এ অনুষ্ঠানের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এর পরপরই কন্যাপক্ষের দাবী দাওয়া অর্থাৎ দাভা, উবোর্ খজ্জি, বোয়ালী ইত্যাদির পরিমাণ ঠিক করা হয়ে থাকে। একে বলা হয় 'ধরা বানাহ্'। এই বৈঠকে একেবারে বিয়ের দিন তারিখও ঠিক করা হয়ে থাকে। পণের টাকা আর 'উবোর্ খজ্জি বাবদ' কিছু দাবী দাওয়া থাকলে সে সব বিয়ের কিছুদিন আগেই আদায় করে দিতে হয়।

চাকমা সমাজে ঘর জামাই হওয়ারও রেওয়াজ আছে, তবে খুব কম। সেসবের বেলাতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘর জামাই থাকা একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের হয়ে থাকে। মেয়াদ অন্তে জামাইয়ের বৌ নিয়ে পৃথকান্নে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকে। শ্বশুরের কোন পুত্র সন্তান না থাকলে তখন অবশ্য ভিন্ন কথা।

গতানুগতিক প্রথা ছাড়া চাকমা সমাজে আরেক প্রকার সুপ্রাচীন বিবাহরীতি প্রচলিত আছে যার নাম 'ধাবামানা' বা ইলোপমেন্ট। যুবক-যুবতী মনোমিলন হয়ে অনেক সময় বিবাহিত হওয়ার ইচ্ছায় একত্রে জঙ্গলে কিংবা কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে আত্মগোপন করে। এ সময় স্বভাব ই তাদের আত্মীয় স্বজন কিংবা সঙ্গী সাথীদের কেউ না কেউ তাদের সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়ে থাকে। সে প্রতিদিন সবার অলক্ষ্যে বহির্জগতের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সঙ্গোপনে গুপ্ত ঘাঁটিতে গিয়ে তাদের খবরাখবর দিয়ে আসে

এবং বিপদে আপদে রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করে। উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এলে এবং বাপ মায়ের মনোভাব অপেক্ষাকৃত অনুকূল মনে হলে এক সময় পলাতক ও পলাতকা তাদের গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসে। তখন মেয়েটির মা বাপের কাছে একটা ফয়সালার জন্য লোক যায়। কোন রকম বাধা কিংবা সম্বন্ধে না আটকালে মেয়েটির মা বাপের দাবী মেনে নিয়ে এবং সমাজের দাবী মিটিয়ে দিয়ে তখন পলাতক যুগলের বিয়ে হতে পারে। মেয়ের মা বাপের অমত থাকলে কিন্তু গণ্ডগোল লেগে যায়। তখন কিছুতেই আর তাদের বিয়ে হতে পারেনা। সামাজিক বিধান মতে মেয়েটিকে তখন তার মা বাপের কাছে ফেরত দিতে হয়। এভাবে মেয়ের বাপ তিনবার পর্যন্ত মেয়ে ফেরত পাওয়ার অধিকারী থাকে। ছেলেটি চার বারের বারও মেয়েটিকে ফুসলে আনতে পারলে তখন আর কারো মতামতের তোয়াক্কা না করে তাদের বিয়ে হতে পারে।

বিয়ের জন্য নির্দ্ধারিত দিনে বরযাত্রী দল বৌ আনতে যায়। চাকমা বর কিন্তু ঘরেই থাকে কেননা আসল বিয়ের অনুষ্ঠানটা বরের বাড়ীতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। বর যাত্রীদলে মধ্যে কয়েকজন বিশেষ পুরুষ এবং নারীর বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। যেমন,—

(১) শ্যালিকা : পাইওনীয়ার রূপে আগে আগে গিয়ে কনের বাড়ীতে বরযাত্রীদলের আগমন, তাদের সংখ্যা ইত্যাদির খবর নিয়ে যায়।

(২) শাবালা : এর দায়িত্ব, কনের বাড়ীতে গুরুজন স্থানীয়দের নিকট সঙ্গে আনীত মদ পরিবেশন, সেই সঙ্গে কনের জন্যে আনা বৌয়ালী অর্থাৎ বস্ত্রালঙ্কার ইত্যাদি দেখানো। বৌ সাজানোর পালাতেও তার দায়িত্ব থাকে। সেজন্যে এই লোক প্রায়ই কনের দেবর। নন্দাই ইত্যাদি রহস্য সম্পর্কিত লোক হয়ে থাকে। এর ভূমিকা অনেকটা হিন্দুদের 'মিতবর'এর মত।

(৩) ফুর্‌বারেং বুগোনী :- ফুর্‌বারেং বা ফুলবারেং বাঁশ কিংবা বেতের কারুকার্য্য করা ঝাঁপি বিশেষ। উচ্চতায় ২/৩ ফুট, নীচে চার কোণায় চারটি অনুচ্চ বেতের পায়া থাকে। উপরের ডালাটি মন্দিরের চূড়ার আকারে বানানো হয়। এই ফুরবারেং এখন আর প্রায় দেখা যায়না। একজন

সুন্দরী সুশ্রী কুমারী মেয়ে ফুর্‌বেরাটি পিঠে ঝুলিয়ে নেয়। এর মধ্যে থাকে যাবতীয় বৌয়ালী। সাধারণতঃ বরের কনিষ্ঠ সহোদরা কিংবা বরের অপেক্ষা বয়সে ছোট কোন আত্মীয় কন্যাকে এ কাজের জন্য বাছাই করা হয়ে থাকে। অবশ্য এ কাজের জন্য তার কিছু প্রাপ্তিযোগেরও বিধান আছে। আজকাল ফুর্‌বেরা এর চল উঠে গেছে। এখন শাবালাই প্রায় ক্ষেত্রে সুটকেস এ ভরে বৌয়ালীগুলো নিয়ে যায়।

(৪) বৌ ধরনী :—একজন সধবা প্রাচীনা। যাঁর প্রধান দায়িত্ব হলো নূতন বৌকে সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণে পথ দেখিয়ে ঘরে এনে তোলা।

(৫) বরের পিতৃস্থানীয় একজন বয়স্ক লোক, যাঁর উপর বরযাত্রী দল পরিচালনার ভার থাকে। বিয়ে বাড়ীতে সে মুখপাত্র হয়ে কথা বলে আর কোন গোলযোগ দেখা দিলে বরকর্ত্তার দায়িত্ব নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করে।

স্থানে স্থানে আড়াআড়ি বাঁশ ফেলে বরযাত্রীদলের পথরোধ করার প্রথা গ্রামাঞ্চলে এখনও কিছু কিছু দেখা যায়। এই প্রথা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। আগেকার দিনে আর কোথাও না হোক কনের পাড়ার সীমানায় পৌঁছতেই পাড়ার যুবকেরা 'যুদ্ধং দেহি' ভাব নিয়ে একবার বরযাত্রীদের পথ আটকাবেই। এটা বোধ হয় সুপ্রাচীন কালেরই একটা লুপ্তাবশেষ প্রথ - শক্তি পরীক্ষার ভিতর দিয়ে কন্যা অর্জনই যার লক্ষ্য। এখন অবশ্য দণ্ড দিতে হয় সামান্যই; এক বোতল মদ কিংবা পাঁচ দশ টাকা ফেলে দিলে অবাধ গমনের অধিকার মিলে দস্তুর মাফিক ফয়সালা না করে বাঁশ ডিঙোতে গেলে কিন্তু বিষম বিপদ। এরূপ ক্ষেত্রে এখনও সত্যি সত্যি একটা গণ্ডগোল বেঁধে যেতে পারে। তবে অবশ্য সেরকম কেউ করেনা। সাধারণের বিশ্বাস, এসব প্রতিরোধ বৈধভাবে দূর করা না হলে বর কনের ভবিষ্যত জীবনে নানাবিধ অমঙ্গল দেখা দিতে পারে।

চাকমা বিয়ের অনুষ্ঠানকে বলে 'চুমুলাং'। এ বিষয়ে পুস্তকের প্রথম ভাগে 'চুমুলাং' অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। তবে চাকমা বিয়েতে আরেক অনুষ্ঠান রয়েছে। যার নাম 'জদন্ বানাহ'। অনুষ্ঠানটি এক প্রকার স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং এতেই বর কনের বিয়ে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে। এতে কোন মন্ত্রোচ্চারণের বালাই নেই। চুমুলাং অনুষ্ঠানের পরে অঝা কিংবা শাবালা অথবা বর কনের ঠাট্টা সুবাদের যে কোন লোক সাধারণতঃ বর কনের ভাবী বসবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে একখানা পাটির উপরে বরের বামে কনেকে বসিয়ে উচ্চৈস্বরে বিয়েতে উপস্থিত জন মণ্ডলীর মতামত প্রার্থনা করে,-'জদন্ বানি দিবার্ উখুম্ আঘে নে নেই ?' অর্থাৎ বর কনের জোড়া বাঁধার হুকুম আছে কিনা। সকলে তেমনি উচ্চৈস্বরে 'আছে, আছে,-বলে স্বীকৃতি জানালে উক্ত লোক তখন সঙ্গে সঙ্গে একখানা সাতহাত লম্বা বস্ত্র খণ্ড নিয়ে উপবিষ্ট বর আর কনের কোমরে একত্রে বাঁধে সমাজে কোথাও যাতে গোপনে অবৈধ বিবাহ সম্পন্ন হতে না পারে তজ্জন্য এই বিধি বিধান চালু হওয়ার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য বলে আমার মনে হয়। এরপর বরের বামহাত কনের পৃষ্ঠ বেষ্টন করে তার বাম কাঁধে অনুরূপভাবে কনের ডান হাত বরের ডান কাঁধে বসিয়ে দিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। ঐ স্থানে সাধারণতঃ বর কনের ঠাকুর্দা ঠাকুরমা ইত্যাদি বুড়ো বুড়িরাই উপস্থিত থাকে, ব্যাপারটা যাতে তাদের পক্ষে কম লজ্জাজনক আর সহজ হয়ে পড়ে। ঐ অবস্থায় কিছু ডিম মাখা ভাত বরের বাম হাতে ও কনের ডান হাতে তুলে দিয়ে পরস্পরকে খাইয়ে দিতে বলা হয়। এভাবে তাদের পানও খাওয়ানো হয়ে থাকে। তারপর আবার সমাজের অনুমতি নিয়ে যখন তাদের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়ে থাকে তখন বর আর কনে তড়িৎ গতিতে আসন থেকে উঠে পড়ে। সাধারণের বিশ্বাস যে এই আসন থেকে আগে উঠতে পারে, সে-ই সারাজীবন অপরজনের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারবে।

চাকমা বিয়েতে যেন তেন প্রকারের একটা সামাজিক খানা দেওয়া

একরূপ বাধ্যতামূলক। অন্ততঃ পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে এই খানা চুকিয়ে দিতে হয়। এর নাম চাকমা ভাষায় 'খানা সিরানা'। এর ব্যত্যয় ঘটলে সামাজিক দণ্ডের বিধান আছে। বিয়ের খানায় 'টক' একটা অপরিহার্য ব্যঞ্জন, চাকমা ভাষায় যাকে 'খাদা' বলা হয়ে থাকে। খাদা খাওয়া না হলে 'খানা সিরানা' ব্যাপারটাই একরূপ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিয়ের অব্যবহিত পরেই নবদম্পতিকে কনের বাপের বাড়ীতে জোড়ে যেতে হয়। বস্তুতঃ কনের বাপের বাড়ীতেই স্বামী স্ত্রীর প্রথম নিশি যাপন বিধি। একে বলে 'ব্যাস্যুদ্ ভাঙা'। ব্যাস্যুদ্ ভাঙার পূর্বে নতুন বৌ আর নতুন জামাইয়ের ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত কারো বাড়ীতে উঠা নিষেধ। অনিবার্য কারণে অচিরকাল মধ্যে ব্যাস্যুদ্ ভাঙা যাওয়া সম্ভব না হলে নিকটস্থ কনের গোষ্ঠী-ভুক্ত কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে যাওয়া বিধেয়। তদভাবে পত্রবহুল কোন সবুজ গাছের নীচে গিয়ে চড়ুইভাতির মত একবেলা পানাহার করে এলেই চলে।

মৃত সৎকার

চাকমা সমাজে কারো মৃত্যু হ'লে মৃতদেহ দাহ করা হয়ে থাকে। তবে একেবারে কচি শিশু কিংবা কোন সংক্রামক রোগে মৃত ব্যক্তির দেহ না পুড়িয়ে কবর দেওয়ার বিধান আছে। শিশুর কবরকে চাকমা কথায় 'পুয়া কবা' বলে আর বয়স্ক লোকের কবরকে বলা হয় 'গোর'। সাধারণতঃ দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামলে ঘর থেকে মড়া বের করে শ্মশানে নেওয়া হয়। তার আগে মড়া বার করা যায় না। চাকমাদের মধ্যে কিন্তু বুধবারে মৃত সৎকার হয়না। কোথাও যেতে হলেও চাকমাদের পক্ষে ঐদিন একদম যাত্রানাস্তি। মৃত্যুর সাথে সাথে অর্থাৎ একই দিনে মৃত সৎকার করাও সম্ভব হয়না, কারণ এ কাজে প্রস্তুতি লাগে এবং মৃতের আত্মীয়বর্গের জড় হতেও সময়ের দরকার হয়। সাধারণতঃ মৃত্যুর পরবর্তী দিনেই দাহক্রিয়া

সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। আগেকার দিনে শবদাহ থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত মৃতের যাবতীয় শেষকৃত্য রুরিদের পৌরহিত্যেই সমাধা করা হত। এখন এসমস্ত অনুষ্ঠানাদিতে বৌদ্ধ ভিক্ষু আমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

কোন বাড়ীতে কারো মৃত্যু হলে তার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত ঐ বাড়ীতে অশৌচ চলে। সাধারণতঃ সপ্তাহকাল পরে মৃতের শ্রাদ্ধ দেওয়া হয়। এজন্য চাকমা সমাজে শ্রাদ্ধকে সাদ্দিন্যা বা সাপ্তাহিক ক্রিয়া বলে। বৎসরান্তে মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। চাকমারা মৃত্যুবার্ষিকীকে বলে বোজোরি'। অবস্থাপন্ন ঘরে উপর্যুপরি তিন বৎসর কাল পর্যন্ত মৃতের বোজোরি দেওয়া হয়ে থাকে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর দুয়ারে দুয়ারে মাটির মালসাতে আগুন রাখা হয়। বোধ হয় কোন অপদেবতার অনুপ্রবেশ নিবারণের উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়ে থাকে। মৃত সংকার পর্যন্ত এগুলি জলতে থাকে এবং সে পর্যন্ত বাড়ীতে অরন্ধন ব্রত পালিত হয়। অতঃপর সাপ্তাহিক ক্রিয়া পর্যন্ত বাড়ীস্থ সকলে এবং অপরা-পর আত্মীয়বর্গ নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করে। মৃত সৎকারের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে থাকে।

মৃতকে গোসল করানোর জন্যে প্রথমে যেমন তেমন একটা খাটিয়া তৈয়ার করা হয়। গোসল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়। মৃত বহনের জন্যও আলাদা একটা খাটিয়া তৈয়ার করা হয়ে থাকে। এটাকে বলা হয় 'আলং'। বাঁশ কাঠ দিয়ে এটাকে একটু মজবুত করে বানাতে হয়। শ্মশানকে চাকমা ভাষায় 'চবাশাল' বলে আর চিতাকে বলা হয় 'রুভাকুর্' 'রুভাঘর'। চিতা সাজানোরও বিশেষ পদ্ধতি আছে। চিতার দৈর্ঘ্য বিবেচনা করে প্রথমে তিন সারি কাঁচা কাঠের খুঁটি পুঁতে নিতে হয়। এগুলোকে বলে 'খুংগাছ'। এগুলোর ফাঁকে ফাঁকে এক প্রস্থ কাঠ দিয়ে খুঁটিগুলোতে জোড়ায় জোড়ায় বাঁধতে হয়। এটাকে বলে এক পল্লা অর্থাৎ এক পরত। এমনিভাবে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে পাঁচ পল্লা এবং স্ত্রীলোক হলে সাত পল্লা কাঠ চিতায় চাপাতে হয়। কাঠের

উচ্চতা যত বাড়ে চিতার উপরের দিকটাও তত প্রশস্ত হয়ে পড়ে। এরপর চিতার ধারে পাশে ইচ্ছেমত কাঠ চাপানো চলে। চিতার উপরে আবার 'চান্নোয়া কানি' অর্থাৎ চাঁদোয়া খাটাতে হয়। এর জন্য চারটি এমন লম্বা বাঁশ লাগে যাতে চিতার আগুনের শিখা চাঁদোয়াটাকে স্পর্শ করতে না পারে। চিতায় আরেকটি জিনিষ বানাতে হয়, যার নাম 'রাধাঘর'। রাধা-ঘর আজকাল অনেকে করেনা, তবে গাঙীটানা উৎসবের জন্য এটি অপরি-হার্য। পরবর্তী অধ্যায়ে এর নির্মাণ পদ্ধতি দেওয়া গেল

মৃত সৎকারের আগের দিন রাত্রে মৃতের জন্য নতুন হাঁড়িতে ভাত রান্না করে নতুন সরা চাপা দিয়ে উনুনের উপুরে রেখে দিতে হয়। এগুলোকে বলে 'কানজাবা ভাত'। সাধারণের বিশ্বাস মৃত আত্মা এই ভাত খেতে আসে। অনেক সময় নাকি ঢাকা দেওয়া ভাতের উপর কিংবা উনুনের আশে পাশে তার চিহ্ন পাওয়া যায়। পরদিন হাঁড়ির ভাত কলা পাতায় মুড়ে মৃতের জন্যে চারটি ভাতের মোচা বেঁধে দেওয়া হয়। সকালে মৃত ব্যক্তিকে স্নানের খাটিয়াতে তুলে বাইরে এনে স্নান করানো হয়ে থাকে। তারপর নতুন জামা কাপড় পরিয়ে মাথায় খবং জড়িয়ে 'সিংকাবা' অর্থাৎ বহির্বাটীতে এনে আলং এর উপর শোয়ানো হয়। আলং এর উপর মৃতের জন্য বিছানা পাতারও বিধি বিধান আছে। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে নতুন পাটির উপর পাঁচ পরত এবং স্ত্রীলোক হলে সাত পরত নতুন কাপড় দিয়ে বিছানা পাততে হয়। মৃতের আপাদমস্তক নতুন চাদরে ঢাকা দেওয়া থাকে। এই সময় মৃতদেহের উপরে এবং আশে পাশে হরেক ফুলও দেওয়া হয়ে থাকে। এরপর থেকে শ্মশানে না নেওয়া পর্যন্ত মৃতের আত্মীয় অনাত্মীয় সবাই মৃত সৎকার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসে, প্রত্যেক মৃতের বুকের উপর কিছু না কিছু অর্থদান দিয়ে থাকে। এগুলোকে বলে 'বুগোকড়ি' অর্থাৎ বুকের কড়ি। এ সবের উপর গৃহস্থের কোন দাবী থাকেনা। এ বাবদ প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থকড়ি মৃত সৎকার এবং মৃতের সাদ্দিন্যা অর্থাৎ সাপ্তাহিক ক্রিয়া অনু-

ষ্ঠানের জন্য দান সামগ্রী সংগ্রহে ব্যয়িত হয়। মৃতের কাপড়ে খুঁটে সিকি আধুলি যা'হোক একটা পয়সা বেঁধে দেওয়া হয় যা তার পারের কড়ি মনে করা হয়ে থাকে। হিন্দু বিশ্বাস মতে মৃত্যুর পরে স্বর্গ গমনের পথে বৈতরণী নদী পার হতে হয়। এখানে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শ্মশানে নেওয়ার প্রাক্কালে মৃতদেহ বাহির প্রাঙ্গনে এনে রাখা হয়। এখানে মৃতকে সামনে রেখে সমবেত ভাবে সকলে বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল নিয়ে বুদ্ধ মন্ত্র শ্রবণ করে। এর পর মৃতকে খাওয়ানো এবং মরায়্ জেদ য়্ ফারক্ ইত্যাদি অনুষ্ঠান। শেষোক্ত ব্যাপারে প্রথমে মৃতের খাটিয়ার সঙ্গে সাতগাছি সুতো বেঁধে অপর প্রান্ত মৃতের পরিবারস্থ সকলে ধরে থাকে। অনেকে এ সময় সুতোয় একটা মুরগীও বেঁধে দেয়। তারপর উপস্থিত সকলের কাছে উচ্চৈস্বরে তাদের মতামত চাওয়া হয়ে থাকে, 'মরায়্ জেদায়্ ফারক্ গুরি দিবার উঘুম আঘে নে নেই? অর্থাৎ মৃত আর জীবিতদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার হুকুম আছে কিনা। সবাই তেমনি উচ্চৈস্বরে 'আছে, আছে' বলে সম্মতি দিলে সুতোটা তখন মাঝখানে এককোপে কেটে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পরেই শবযাত্রা করতে হয়। কারণ, এর পরে আর মৃতদেহ ঘরে রাখা চলেনা। শ্মশান যাত্রার পথে পথে খৈ ছিটানোর নিয়ম, তবে বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কটের দিনে এটা আর সম্ভব হয়ে উঠেনা। এখন শুধু শ্মশানে শব নিয়ে চিতা প্রদক্ষিণের সময় মাত্র কিছুটা খৈ ছিটানো হয়ে থাকে। শ্মশানে প্রথমে খাটিয়া শুদ্ধ শবদেহ রাধাঘরের উপর তুলে চিতা প্রদক্ষিণ করতে হয়। পুরুষ হলে পাঁচবার এবং স্ত্রীলোক হলে সাতবার। প্রতিবার প্রদক্ষিণের পর চিতার সঙ্গে রাধাঘর ঠেকানো হয়ে থাকে। একে বলে 'চিতা সালামী'। প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তখন রাধাঘর থেকে শবদেহ নামিয়ে খাটিয়া সহ চিতায় তুলে দেওয়া হয়। এই সময় শেষবারের মত মৃতকে আরেকবার খাওয়ানো হয়ে থাকে। এর পরেই চিতায় আগুন দেওয়া হয়। প্রথমে মৃতের বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠ লোকই চিতায় আগুন দেওয়ার নিয়ম। হিন্দুরা

একে বলেন মুখাগ্নি করা আর চাকমা প্রথা মতে এটা 'আহ্দঅ আগুন দেনা।' অর্থাৎ হাতের আগুন দেওয়া।

পরদিন ভোরে হাড় ভাসান অনুষ্ঠান। প্রথমে চিতায় জল ঢেলে চিতার আগুন নিভিয়ে একটা নতুন হাঁড়িতে মৃতের অস্থি-সংগ্রহ করে রেখে অবশিষ্ট কয়লা এবং ছাই জলে বিসর্জন করা হয়ে থাকে। এজন্য চাকমাদের শ্মশান মাত্রেই জলের ধারে করা হয়। এরপর চিতা লেপে মাঝখানে জাফরি বেড়া দিয়ে চতুষ্কোণ আকারে একখানা ঘেরা দিতে হয়। তার একধারেএক-খানা খোলা দরজা থাকে। অনেকে এই ঘেরাটার উপর যেমন তেমন একখানা চালা করে দেয়। ঘেরার ভেতরটায় কলাপাতা পেড়ে মৃতের জন্য অনেক কিছুই রেখে আসা হয় যেমন, মেমা মিচ্চিরি অর্থাৎ চিনি মিছরি ইত্যাদি মিষ্টিসহ হরেক রকমের পিঠা, জলভরা একটি নতুন কলসী এবং একটি নতুন কত্তি,* তামাকসহ হুঁকো কলকে, আয়না, চিরুণী, পুরানো দা কাঁচি ইত্যাদি। তাছাড়া চারধারে হরেক রকমের শাক সবজির বীজ ছিটানো হয়ে থাকে। সাধারণের বিশ্বাস এভাবে শ্মশানে দিয়ে আসা চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়ালে মরামাস দূর হয়।

এরপর আসল হাড় ভাসান অনুষ্ঠান। মৃতব্যক্তির ছেলে যারা চিতা পরিষ্কার করতে আসে তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সাতগাছি সুতার একপ্রান্ত ধরে তীরে দাঁড়িয়ে থাকে আর অপর একজন বয়ঃকনিষ্ঠ লোক অপরপ্রান্ত তার বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে জড়িয়ে নিয়ে সংগৃহীত অস্থিসহ হাঁড়িটি নিয়ে জলে নামে। সে ব্যক্তি তীরমুখী হয়ে জলে দাঁড়িয়ে এক, দুই, তিন করে ছয়বার হাঁড়িটি জলে চুবিয়ে তোলে আর সপ্তমবারে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে একডুব দিয়ে উঠেই হাঁড়িটা মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে পেছনে গভীর জলে ছুঁড়ে মারে। এসময় তার পেছনে ফিরে দেখতে নেই।

---

* একপ্রকার মাটির তৈরী জলপাত্র, দেখতে অনেকটা গাড়ুর মত। গলাটা সরু এবং ঈষৎ লম্বা।

অতঃপর তীরে দাঁড়ানো লোকটি হাতের সুতো টেনে তাকে ডাঙ্গায় উঠিয়ে নেয়। সুদাম্ অর্থাৎ সামাজিক বিধিমতে মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ পুত্রকেই এভাবে হাড় ভাসাতে হয়। চাকমা সমাজে বাপের কিংবা মায়ের মৃত্যুতে ছেলেদের মাথা মুড়ানো নিয়ম। একাজটা হাড় ভাসানের দিন শ্মশানে কিংবা বাড়ীতে বসেও সমাধা করা যায়। সাধারণতঃ যার যে বাড়ীতে মৃত্যু হয় সে বাড়ীতেই তার শ্রাদ্ধ দেওয়া হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান না থাকলে ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে কাউকে এসে তখন মৃত সংকার, হাড় ভাসান, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কাজের ভার নিতে হয়।

চাকমা সমাজ লারমা, ধাবেং, কুরাকুত্যা, বড়ুয়া, ওয়াংঝা ইত্যাদি ছত্রিশ গঝা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মৃত সংকার বিষয়ে এযাবৎ যা' যা' বলা হয়েছে গঝা ভেদে সেগুলি সম্পাদনে কিছু কিছু হের ফের হয়ে থাকে। তবে সংকার পদ্ধতি মোটামুটি একই। হাড় ভাসানের দিন সংকার কাজে আমন্ত্রিত ভিক্ষুকে ভোজন করানো হয়ে থাকে। মগ ভাষায় একে বলে 'হ্লাপ্লোই সুয়েং'। এইদিন থেকে মৃতের বাড়ীতে রান্নাবান্না করা চলে। সাপ্তাহান্তে মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধ দেওয়া হয়। তবে এই সাতদিন গণনার মধ্যেও কিছুটা হের ফের হয়ে থাকে। অনেকে মৃত্যু দিবস থেকে, কেউ কেউ দাহক্রিয়ার দিন থেকে আবার কেউ কেউ হাড় ভাসানের দিন থেকেও এই সাতদিন গণনা করে থাকে।

শ্রাদ্ধের দিন ভিক্ষু ভোজনসহ প্রচুর লোকজন খাওয়ানো হয়। এই সময় মৃতের উদ্দেশ্যে আদারাহ্ অর্থাৎ পিণ্ডদান এবং মৃত আত্মার সদগতি কামনায় উপস্থিত ভিক্ষু সংঘকে বিবিধ দান দেওয়া হয়ে থাকে। সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরে ভিক্ষু ব্যবহার্য্য অষ্ট পরিষ্কার দান ছাড়া অনেকে গরু, সোনা, রূপা ইত্যাদিও দান করেন। শ্রাদ্ধের আগের দিন সন্ধ্যা সমাগমে শ্রাদ্ধকারী চিতায় বিধিমতে প্রদীপ জ্বালিয়ে মৃত আত্মাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসে। মৃত সংকার কাজে যাঁরা অংশ নিতে আসেন শ্রাদ্ধের সময় তাঁদের সকলকে

নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গ এবং মৃতের আত্মীয়স্বজন প্রত্যেকে মৃতের উদ্দেশ্যে দান দেওয়ার জন্য কিছু না কিছু দানীয় সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই সমস্ত বিবিধ সামগ্রী এবং মৃতের বুগোকড়ি ও গৃহস্থের নিজস্ব অর্থানুকুল্যে সংগৃহীত যাবতীয় দান সামগ্রী সম্মিলিতভাবে মৃত আত্মার উর্দ্ধগতি কামনায় দক্ষিণাসহ জল ঢেলে ভিক্ষু সংঘকে দান দেওয়া হয়ে থাকে। অনেকে শ্রাদ্ধের সময় মৃতের চিতায়ও ভাতজ্যার মত মৃতের জন্য পৃথক আদারাহ্ নিবেদন করে আসে। চিতায় সারি সারি তাংগোন্ অর্থাৎ কাপড়ের ধবজা পতাকা ওড়ানো হয়। সূত্র পিটকে ধজগ্‌গ পরিত্তং নামে একটি পরিত্রাণ সূত্র আছে, তারই অনুসরণে চাকমাদের মৃতের চিতায় এই কাপড়ের ধবজা ওড়ানো হয়ে থাকে।

আগেকার দিনে চাকমা সমাজে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে প্রচুর দৈ খাওয়ানো হত। বিবাহ ভোজে যেমন 'খাদা' অর্থাৎ টক, শ্রাদ্ধের সময় তেমনি দৈ ছিল অপরিহার্য্য। তখন শ্রাদ্ধ মানেই ছিল দৈ খাওয়া। কারো মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র তখনকার দিনে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যারাই গবাদি পশুর মালিক তারাই পরদিন থেকে মাটির কলসীতে দৈ বসানো শুরু করতেন এবং সপ্তাহকালের মধ্যে যা' দৈ জমতো সে সবই বিনা মূল্যে মৃত আত্মীয়ের 'সাদ্দিত্যায়' দিয়ে আসতেন। এখন আর দৈ কোথায়? সে সব দিনের কথা এখন স্বপ্ন।

গাড়ী টানা

চাকমা সমাজে কোন প্রতিপত্তিশালী লোকের মৃত্যু হলে তাঁর মরদেহ নিয়ে রথটানা উৎসব চলে। চাকমারা এ উৎসবকে বলে 'গাড়ীটানা'। মৃত্যু অবশ্য সবসময়ই শোকাবহ; কিন্তু কোথাও কারো মৃত্যুতে তাকে নিয়ে

গাড়ীটানা হবে ঠিক করা হলে তখন গোটা অঞ্চলে সাড়া পড়ে যায়। শোকোৎসব তখন একটা মহোৎসবের রূপ নেয়। গাড়ীটানা উৎসবের প্রস্তুতিও তেমনি বেশ ব্যাপক। এতে বেশ কয়েক পাড়ার লোকের সক্রিয় সহযোগিতা দরকার হয়ে পড়ে। যেই যেই পাড়ার লোকের উপর যেই বিশেষ বিশেষ কাজের ভার ন্যস্ত হয় সেই সেই পাড়ার লোকও বিনা দ্বিধায় স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে সে কাজটা সমাধা করে দিয়ে থাকে। সবাই মনে করে এ সমস্ত কাজে শরিক হলে বিপুল পুণ্যের ভাগী হওয়া যায়। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে চাকমা সমাজে মৃত সৎকার কাজে কেউ কাউকে বলার অপেক্ষা রাখেনা, স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে সবাই এসে একাজে অংশ গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া প্রতি পাড়াতে কিছু কিছু লোক থাকে, যারা এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা রাখে। গাড়ীটানার প্রস্তুতি পর্ব সম্পূর্ণ হতে ২।৩ দিন লেগে যায়। ততদিন শবদেহটাকে যতদুর সম্ভব অবিকৃত রাখা যায় সেজন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। গাড়ীটানা উৎসবের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন।

১। গাড়ীঘর বা রথ নির্মাণ
২। গাড়ী ঘিলা বা রথের চাকা তৈয়ারী
৩। গাড়ী কাঝি বা মোটা মোটা বেতের রশি পাকানো এবং
৪। রাধাঘর নির্মাণ।

গাড়ীঘর ঃ

গাড়ীর পাটাতনের মত একটা মজবুত কাঠামোই হচ্ছে গাড়ীঘর। একটা রাধাঘর এটার উপর স্বচ্ছন্দে বসানো যেতে পারে এরূপ পরিমাপে এটা বানানো হয়ে থাকে। মজবুত বেশ কিছু কাষ্ঠদণ্ড লম্বালম্বি সারি করে প্রস্থে অনুরূপ কয়েকটা কাষ্ঠদণ্ডের সাথে শক্তভাবে বাঁধা হয়। এর নীচে অগ্রপশ্চাৎ দুইদিকে চাকা লাগানোর জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত থাকে।

পাটাতনের উপরে সমান মাপের তক্তার বেড়া বুনে দেওয়া হয়।

গাড়ীঘিলা ঃ

গাড়ীটানার জন্যে চারটি চাকার দরকার হয়। এগুলি উপরোক্ত গাড়ী ঘরের নীচে লাগানো হয়ে থাকে। তবে দৈব দুর্বিপাকের মোকাবেলার জন্যে দু'টি চাকা বেশী বানানো হয়। মোটা মোটা গাছ কেটে সাইজ করা টুকরো টুকরো গাছের কাণ্ড থেকে এগুলো খুঁদে বার করা হয়ে থাকে।

গাড়ীকাঝি ঃ

গাড়ীটানা কাজে প্রায় ১৫/ ৬ খানা মোটা পাকানো রশি লাগে। কচি বাঁশের বেত দিয়ে এ সমস্ত রশি পাকানো হয়ে থাকে। এগুলো মুষ্টিতে ধরে এরূপ মোটা আর এক একটার দৈর্ঘ্য ৬০/৭০ হাতও হতে পারে। প্রাথমিক ভাবে গাড়ীতে সামনে পিছনে তিনটা করে ছয়খানা রশি লাগে। জন সংখ্যার অনুপাতে রশির সংখ্যাও বাড়ানো হয়ে থাকে। তাছাড়া টানাটানির সময় অনেক রশি ছিঁড়ে যায় সেজন্যেও যথেষ্ট সংখ্যক বাড়তি রশির জোগাড় রাখতে হয়। এ কাজটা তাই এক এক পাড়ার লোকের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনা।

রাধাঘর ঃ

'রাধাঘর' মড়া বা শবদেহ রাখার আলাদা একটা বিশেষ ব্যবস্থাপনা। রাধা অর্থ মড়া। চাকমা ভাষায় মগদা, রাধা, পাল্যেং, গিগ্‌গিনি, চম্বেং, চম্রেং ইত্যাদি শব্দ সমার্থবোধক। প্রথমে বাঁশ দিয়ে রাধাঘরের কাঠামোটা তৈয়ার করতে হয়। তারপর বাঁশের চাটাই দিয়ে এর চার পাশটা মুড়ে দেওয়া হয়ে থাকে। তলার দিকটা মুখ খোলা থাকে, তবে উপরের মুখে শবদেহ রাখার জন্যে একটা পাটতন করে নিতে হয়। জিনিসটা যদিও চতুষ্কোণ হয়ে থাকে, আকারে অনেকটা ডম্বরুর মত, মাঝখানে খানিকটা চাপা।

এর উপর শবদেহ রেখে গোটা রাধাঘরটাই গাড়ীঘরের উপর চাপিয়ে দিয়ে চারধারে গাড়ীর সঙ্গে মজবুত করে বাঁধা হয় যাতে এপাশে ওপাশে কোন দিকে হেলে পড়তে না পারে। পাটাতনের উপরে শবদেহ রাখার জায়গা মজবুত জাফরি বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে। তারপর একটা লম্বা বাঁশ আগার দিকে হাতখানেক অক্ষত রেখে তার নীচের দিকটা লম্বালম্বি সমান চার ফালি করে এক একটা ফালি উপরোক্ত বেড়ার চারকোণের চারটি খুঁটির মাথায় ঢুকিয়ে বসানো হয়। তখন এই জিনিসটা একটা মন্দিরের গম্বুজ কিংবা রথের চূড়ার মত দেখায়। বাঁশের অক্ষত অংশটার মাথায় 'খাদি' দিয়ে বানানো একটা মূর্ত্তির মত জিনিস ঝোলানো হয়ে থাকে। চাকমারা এটাকে বলে 'ক' অর্থাৎ ঘুঘু পাখী। চাকমা বিশ্বাস মতে 'ক' শান্তির প্রতীক। এসব ছাড়াও হরেক রকমের কাগজে ফুল পতাকা দিয়ে রাধাঘরটাকে অপরূপ সাজে সাজানো হয়ে থাকে।

সব কিছু তৈরী সম্পূর্ণ হয়ে গেলে নির্দ্দিষ্ট দিনে পড়ন্ত বেলায় গাড়ীটানা শুরু হয়। তখন গাড়ীটানার মাঠ লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে, অনেক দোকানপাটও তখন বসে যায়। সারা অঞ্চলের লোকজন তখন এই উৎসবে অংশ নিতে আসে। এই গাড়ীটানা অনেকটা শবদেহ নিয়ে 'টাগ্ অব ওয়ার' খেলার মত। মৃত ব্যক্তির মরদেহ রথের উপরে রেখে দলে বেদলে বিভিন্ন রকমে এই গাড়ীটানা প্রতিযোগিতা চলে। কখনও পাড়ায় পাড়ায়, গোত্রে গোত্রে, কখনওবা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে, বিবাহিত অবিবাহিতদের মধ্যে, যুবক যুবতীদের মধ্যে টানাটানি প্রতিযোগিতা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিযোগিতার সময় তুমুল রবে ঢোলবাদ্য বাজে, গোল্লা ফুটে, আকাশে হাউই ছোঁড়া হয়। প্রতি দলের সমর্থকরা দলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে মুখের মধ্যে তর্জনী আর মধ্যমাঙ্গুলি পুরে একপ্রকার তীক্ষ্ণ সিটি বাজিয়ে নিজেদের লোককে উদ্দীপিত করে তোলে। চাকমারা এই প্রকার সিটি বাজানোকে 'খ্যাংশিং' বলে। চাকমাদের মৃত সংকারের সময়কার ঢাকের বাজনাও প্রতিযোগীদের

মধ্যে দারুণ উদ্দীপনা আনে। এই বাজনার একটা বিশেষত্ব আছে। একটা মাত্র ঢাকের উপর দুজন লোক কাঠি দিয়ে এক বিচিত্র তালে এই বাজনা বাজায়। এই তাল চাকমাদের নিজস্ব। প্রতিযোগিতার সময় গাড়ী টানার মাঠটাকে একটা যুদ্ধক্ষেত্র বলেই ভ্রম হতে পারে। প্রতিযোগীদের মধ্যেও তখন যুদ্ধের মতই একটা প্রচণ্ড উন্মাদনা জাগে। সমানে সমানে টানাটানি হলে অনেক সময় ২।১ টা রশি ছিঁড়ে যায়। তখন নতুন রশি এনে তৎক্ষণাৎ সেখানে সংযোগ দিতে হয়। অনেক সময় সমানটানের চোটে রাধাঘর শুদ্ধ সম্পুর্ণ গাড়ীখানাই কোমর সমান উপরে উঠে যায়। এসময় নেতৃস্থানীয় কিছু লোক গাড়ীর পাশে থেকে সজাগ দৃষ্টি রাখে যাতে কোন অঘটন ঘটতে না পারে। এভাবে দিনের বাকী সময় গাড়ী টানা-টানি করে সন্ধ্যার সময় শবদেহ নামিয়ে চিতায় তুলে দেওয়া হয়।

কিংবদন্তী মতে চাকমাদের পূর্ব পুরুষ রাজা সাধেংগিরি এই প্রকার রথে চড়ে সশরীরে স্বর্গে গমন করেন। তখন থেকে রথে তারই অনুসরণে চাকমা সমাজে রাজা কিংবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হলে এভাবে তাঁকে সম্মানিত করা হয়ে থাকে। রাঙ্গামাটিতে শেষ গাড়ীটানা উৎসব চলে ১৯৮০ ইংরেজীতে। স্থানীয় আনন্দ বিহারে অধ্যক্ষ উ জবন তিষ্য মহাস্থবিরের মহাপ্রয়ানে তাঁর মরদেহ নিয়ে মহা সমারোহে 'তখন গাড়ীটানা উৎসব উদযাপিত হয়। সম্প্রতি ৯৯ নং ঘাগড়া মৌজার হেডম্যান বাবু স্নেহ কুমার দেওয়ান মাতা শশী কুমারী দেওয়ানের মৃত্যুতে তাঁর মরদেহ নিয়ে বিগত ১৪।১২।৮৫ ইং তারিখে বিপুল সমারোহে গাড়ীটানা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

পরিশিষ্ট

হাল আমলে চাকমা সমাজে বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্জাগরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সে কারণে বৌদ্ধ ধর্মভিত্তিক আচার অনুষ্ঠানগুলোই এখন সমাজে প্রাধান্য পাচ্ছে। পূর্বে ভিক্ষু সমাজ এখানে সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে নিছক নিজেদের প্রচেষ্টায় ধর্মকে কোন রকমে শুধু জীইয়ে রেখেছিলেন। মৃত্যু আর শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারেই শুধু তখন এঁদের দেখা যেত। এঁদেরও অধিকাংশ ছিলেন মারমা সম্প্রদায় ভুক্ত। বস্তুত: ধর্মকথিক ভিক্ষু বলতে এদেশে তখন কেউই ছিলেন না। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে আরাকানের সংঘরাজ মহাপণ্ডিত গুণামেজু মহাস্থবির এদেশে এসে চট্টগ্রাম আর পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম সংস্কার কাজে ব্রতী হন। তারও অনেক পরে বিগত পঞ্চাশের দশকের শেষপাদে রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির ব্রহ্মদেশে শিক্ষা সমাপন করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তখনকার চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় সঙ্গে সঙ্গে তখন তাঁকে রাজগুরু পদে বরণ করে নেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে চাকমা সমাজে তখন ধর্মীয় জাগরণ আসে। ধর্ম সংস্থাপন কাজে তাঁর অবদান বহুব্যাপক। পরবর্তীতে মহাসাধক বনভন্তের আবির্ভাব ঘটলে সেক্ষেত্রে জোয়ার দেখা দেয়। চীবর দান, সংঘ দান, প্রাত্যহিক শীলাচার বিধি ইত্যাদি তখন তাঁর উপদেশে সমাজে ভূয়সী প্রসার লাভ করে। বৈশাখী পূর্ণিমা, বর্ষাবাস, প্রবারণা, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা ইত্যাদি প্রতি বৌদ্ধ পর্বদিনে উপোসথ পালনকারীদের সংখ্যা এখন বেশ প্রচুরই বলা চলে। বিগত ১৯৭৫ ইংরেজীতে লেখকও নিজে ভিক্ষু বর্ষাব্রতের সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুশাসন তলে একাসনিক ও পত্তপিণ্ডিক

পরিশিষ্ট

এ দু'টি ধুতাঙ্গ ব্রতসহ ত্রৈমাসিক প্রতিহার্য্য উপোসথ ব্রত পালন করেন। রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির চাকমা সমাজ জীবনে যেন আগে ভাগে এসে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে যান আর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সেই উর্বর ভূমিতে সদ্ধর্মের বীজ বপন করেন। সেই বীজ এখন অঙ্কুরিত হয়ে শত শাখা প্রশাখা পল্লবে সুশোভিত বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে আজ ক্ষুদ্র রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের দ্বারে দিগন্ত এসে ধরা দিয়েছে।